PUBLISHED BY K. C. GHOSE,
1/3, Prem Chand Boral Street, Calcutta

1931.

PRINTED BY A. C. MANDAL,
SIDDHESWAR PRESS
39-2, Shibnarayan Dass Lane, Calcutta.

বিজ্ঞাপন।

হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের লোকেরই প্রাচীন আখ্যায়িকা-সমূহের এক একটী অমূল্য ভাণ্ডার আছে। এ দেশের বিদ্যালয়সমূহে নানাধর্ম্মাবলম্বী বালকেরা অধ্যয়ন করে বলিয়া শিক্ষক মহাশয়গণ অধ্যাপনার সময় তাহাদিগকে এ সকল শিখাইবার সুযোগ পান না। অথচ শৈশব হইতে এরূপ আখ্যায়িকাগুলির সহিত পরিচয় না ঘটিলে বালকেরা স্ব স্ব জাতীয় আদর্শ জানিতে পারে না। সম্ভবতঃ এই অসুবিধার নিরাকরণের জন্য প্রাইমারী শিক্ষার নববিধানানুসারে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য দুইখানি গল্পের পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—একখানি হিন্দুদিগের, অপরখানি মুসলমানদিগের পাঠ্য।

গল্প নানারূপ হইতে পারে। একশ্রেণীর গল্পে পাত্রগণ ইতর জীবজন্তু বা তরুলতা—যেমন, বিড়াল-তপস্বীর বা রসাল ও স্বর্ণলতিকার কথা। আর এক শ্রেণীর গল্পে কোন পাত্র মনুষ্য, কোনটী বা ইতর জীবজন্তু—যেমন, কঙ্কণলোভী পথিকের কথা। এরূপ গল্প নিতান্ত শিশুদিগের উপযোগী। পৌরাণিকী আখ্যায়িকাগুলি ইহাদের অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শের—মনুষ্যের ও দেবদেবীর কথা লইয়া রচিত। আবার, রামায়ণের ও মহাভারতের অনেক আখ্যায়িকা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরেও প্রতিষ্ঠিত। এই দুই শ্রেণীর আখ্যায়িকাদ্বারাই জাতীয় আদর্শ পরিস্ফুটিত হয় এবং ইহাই হিন্দুবালকদিগের চরিত্রগঠনের প্রধান সহায়।

কেহ কেহ হয় তো আপত্তি করিতে পারেন যে, এই বিজ্ঞানের যুগে আখ্যায়িকার অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলি বলিতে যাওয়া কালবিরুদ্ধ। কিন্তু আমার বিবেচনায় এ আপত্তি অসঙ্গত। যুরোপের বালকেরা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও যখন আগ্রহসহকারে প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদিগের পৌরাণিকী কথাগুলি শিক্ষা করে, তখন হিন্দুবালকেরাই বা তাহাদের পৌরাণিকী

কথাসমূহ হইতে উপদেশরত্ন সংগ্রহ না করিবে কেন? Gorgonএর মুখ দেখিলে লোকে পাষাণে পরিণত হইত, Theseus দে তের পাদুকা পরিয়া আকাশমার্গে বিচরণ করিয়াছিলেন, গ্রীক্ পুরাণের ইরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত কথার তুলনায় যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণকাহিনী বা গঙ্গার অবতরণ-বৃত্তান্ত অতি-প্রাকৃত নহে, বরং হিন্দুসন্তানের পক্ষে আরও সুপাঠ্য, কারণ এ সকল তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ এবং সদুপদেশ-সম্বন্ধে শতগুণে উৎকৃষ্টতর।

উল্লিখিত সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হইয়া আমি রামায়ণ, মহাভারত, জাতক প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে কতকগুলি আখ্যায়িকা সংগ্রহ করিয়া হিন্দু বালক-বালিকাদিগকে উপহার দিলাম। কথাগুলি তাহাদের বোধগম্য করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি; কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

কলিকাতা,
২রা আষাঢ়, ১৩২৯।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

সেকালের কথা

কে বড় ?

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। চরিত্রগুণে তিনি সকলেরই প্রিয় হইয়াছিলেন ; সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে তাঁহার গুণ গান করিত।

একদিন ব্রহ্মদত্ত ভাবিলেন, 'রাজধানীর লোকে ত আমার প্রশংসা করে ; কিন্তু হইতে পারে, আমার যে দোষ আছে, ভয়ে কেহ তাহা বলিতে চায় না। অতএব জনপদে গিয়া দেখি, কেহ আমার কোন দোষ লইয়া আলোচনা করে কি না। যদি কোন দোষের কথা শুনিতে পাই, তবে তাহা পরিহার করিয়া আরও ভাল হইতে পারিব'। এই সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্মদত্ত রথারোহণে ছদ্মবেশে জনপদে প্রবেশ করিলেন। তিনি সর্ব্বত্রই সকলের মুখে নিজের প্রশংসা শুনিলেন ; কুত্রাপি কেহ তাঁহার নিন্দাবাদ করিল না।

এই সময়ে কোশলের রাজা মল্লিকও, তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকের মনোভাব জানিবার জন্য ছদ্মবেশে বিচরণ করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে কোন পর্ব্বতের মধ্যে একটা সঙ্কীর্ণ পথে তাঁহার রথ এবং ব্রহ্মদত্তের রথ বিপরীত দিক্ হইতে পরস্পরের সম্মুখীন হইল। পথের ঐ অংশে এমন স্থান ছিল না যে, রথ দুইখানি পাশাপাশি যাইতে পারে ; একখানা হঠাইয়া না লইলে অন্যখানির অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না।

মল্লিকের সারথি ব্রহ্মদত্তের সারথিকে বলিল, "তোমার রথ হঠাইয়া পথ ছাড়িয়া দাও।" ব্রহ্মদত্তের সারথি বলিল, "তোমারই রথ হঠাও, আমার রথে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত রহিয়াছেন।" কোশলের সারথি উত্তর দিল, "আমার রথে কোশলরাজ মল্লিক আছেন।" তখন বারাণসীর সারথি ভাবিল, 'কোশলরাজের বয়স্ কত জানিয়া, উভয়ের মধ্যে যিনি ছোট, তাঁহার রথ হঠাইবার ব্যবস্থা করা যাউক'। সে কোশল-সারথিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের রাজার বয়স্ কত?" কোশল-সারথি যে উত্তর দিল, তাহাতে দেখা গেল, দুই রাজাই সমবয়স্ক। ইহার পর সে কোশলরাজের ঐশ্বর্য্য, সেনাবল, কুলমর্য্যাদা ইত্যাদির সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল; কিন্তু এই সকল বিষয়েও দুই জনের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখা গেল না। তখন সে স্থির করিল, ইঁহাদের মধ্যে যিনি চরিত্রে বড়, তাঁহাকেই অগ্রসর হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এই অভিপ্রায়ে সে কোশলসারথিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের রাজার চরিত্র কেমন, বল ত?"

কোশলসারথি বলিল :—

কঠোরে কঠোর, কোমলে কোমল,
কোশল-রাজের রীতি;
সাধুজনে তাঁর সাধু ব্যবহার,
শঠে শাঠ্য এই নীতি।
বর্ণিতে কি পারি চরিত্র তাঁহার?
সঙ্ক্ষেপে বলিনু তাই;
অতএব রথ সরা'য়ে তোমার
ছাড়ি দেহ পথ, ভাই।"

ইহা শুনিয়া বারাণসীর সারথি বলিল, "তোমাদের রাজার কি কেবল এই সকল গুণ?" কোশলসারথি উত্তর দিল, "হাঁ, তাঁহার এই সকল গুণ।"

"এ সকল যদি গুণ হয়, ত'বে দোষ কাহাকে বলে?"

"এ সকল যদি দোষ হয়, তবে না জানি, তোমাদের রাজার কেমন গুণ!"

"বলিতেছি শুন :—

অক্রোধের বলে শাসেন ক্রোধীরে,
অসাধুবে সাধুতায়;
কৃপণ যে জন, হেরি দান তাঁর
মনে বড় লাজ পায়;
সত্যের প্রভাবে অসত্যে দমিতে
এমন দ্বিতীয় নাই;
অতএব রথ সরা'য়ে তোমার
ছাড়ি দেহ পথ, ভাই।"

তখন কোশলরাজ ও তাঁহার সারথি রথ হঠাইয়া ব্রহ্মদত্তকে পথ ছাড়িয়া দিলেন।

আরুণির গুরুসেবা।

পুরাকালে ধৌম্যনামক এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার নিকট বহু শিষ্য বিদ্যা শিক্ষা করিত। তখন শিষ্যেরা প্রায় সকলেই গুরুর গৃহে থাকিত, গুরু যাহা খাইতে দিতেন, সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই খাইত এবং প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিত। তাহারা গুরুর গরু চরাইত, বন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিত, ভিক্ষা করিয়া গুরুর জন্য চা'ল, ডা'ল ইত্যাদি সংগ্রহ করিত।

ধৌম্যের কয়েক বিঘা ধান-জমি ছিল। ধানগাছগুলা যখন একটু বড় হয়, তখন তাহাদের গোড়ায় জল থাকা চাই; না থাকিলে ধান ভাল হয় না। এজন্য কোন কোন অঞ্চলে লোকে মাটি দিয়া ক্ষেতের আলি বান্ধে। ইহা করিলে বৃষ্টির সময়ে ক্ষেতের জল ক্ষেতেই থাকিয়া যায়—সরিয়া বাহির হইতে পারে না। এক দিন বিকাল বেলা খুব বৃষ্টি হইতেছিল; ধৌম্য তাঁহার শিষ্য আরুণিকে বলিলেন, "বৎস, তুমি গিয়া দেখ, আমার ক্ষেতের আলি ঠিক আছে কি না?" আরুণি গিয়া দেখিলেন, এক স্থানে আলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং সেই ভাঙ্গা যায়গা দিয়া জল চলিয়া যাইতেছে। তিনি উহা বান্ধিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু যেমন মাটি দিতে লাগিলেন, অমনি তাহা ধুইয়া যাইতে লাগিল। আরুণি তখন নিরুপায় হইয়া ঐ ভাঙ্গা যায়গায় শুইয়া পড়িলেন। ইহাতে জলনির্গম বন্ধ হইল।

এ দিকে সন্ধ্যা হইল। আরুণি তখনও ফিরিলেন না দেখিয়া ধৌম্য উদ্বিগ্ন হইলেন এবং কয়েকজন শিষ্য লইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। তাঁহারা মাঠে গিয়া 'আরুণি', 'আরুণি' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার দেখা পাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।

শিষ্য প্রাণপণে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়াছে দেখিয়া ধৌম্য সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি আরুণিকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎস, আমার আশীর্ব্বাদে তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া নিজের বংশ উজ্জ্বল করিবে"।

উপমন্যুর গুরুসেবা।

ধৌম্যের আর এক জন শিষ্যের নাম ছিল উপমন্যু। তাঁহারও অসাধারণ গুরুভক্তি ছিল। তিনি গুরুর গরু চরাইতেন; সারাদিন বাহিরে থাকিয়া গোধূলির সময়ে গৃহে ফিরিতেন এবং রাত্রিকালে বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। কিন্তু এত কষ্টে থাকিয়াও তিনি বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইতেছেন দেখিয়া, একদিন ধৌম্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কি খাও, বল ত? তুমি যে ক্রমেই স্থূলকায় হইতেছ, ইহার কারণ কি?" উপমন্যু বলিলেন, "গুরুদেব, যখন গরু চরে, তখন আমি লোকালয়ে গিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকি।" ইহাতে ধৌম্য বলিলেন, "দেখ, তুমি ভিক্ষা করিয়া যাহা পাও, তাহা আমাকে দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাকে না জানাইয়া তাহা খাওয়া অন্যায়।"

তদবধি উপমন্যু প্রতিদিন দুইবার ভিক্ষা আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথম বারে যাহা পাইতেন, তাহা গুরুকে আনিয়া দিতেন এবং দ্বিতীয় বারে যাহা পাইতেন, তাহা নিজে খাইতেন। কাজেই তিনি পূর্ব্বের মত হৃষ্টপুষ্টই রহিলেন। ধৌম্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন ইহার কারণ অবগত হইলেন, তখন বলিলেন, "দেখ, দুইবার ভিক্ষা করা ভদ্র লোকের কাজ নয়; ইহাতে গৃহস্থের পীড়ন হয়। ছি! তুমি আর কখনও এমন কাজ করিও না"।

উপমন্যু "যে আজ্ঞা" বলিয়া দ্বিতীয় বার ভিক্ষা করা ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার শরীর পূর্ব্বের মত হৃষ্টপুষ্ট রহিল। গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি এখনও কৃশ হও নাই! এখন কি খাও, জানিতে ইচ্ছা করি।" উপমন্যু উত্তর

দিলেন, "বাছুরগুলা দুধ খাইলে তাহাদের মুখে যে ফেনা থাকে, আমি তাহা পান করি।" ইহা শুনিয়া গুরু বলিলেন, "ছি, এরূপ করিলে বাছুরগুলা যে মারা যাইবে!"

এতদিনে উপমন্যু নিরুপায় হইলেন। তিনি সমস্ত দিন মাঠে মাঠে গরু চরাইতেন, রাত্রিকালে গুরুগৃহে মুষ্টিমাত্র আহার পাইতেন; ক্ষুধার জ্বালায় তাঁহার পেট পুড়িয়া যাইত। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার গুরুভক্তি অটল রহিল; তিনি ঘুণাক্ষরেও গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিতেন না।

এক দিন উপমন্যু মাঠে গিয়া ক্ষুধায় এত কাতর হইলেন যে, আর কিছু না পাইয়া কতকগুলা আকন্দের পাতা চিবাইয়া খাইলেন। ইহাতে তাঁহার চক্ষুর পীড়া জন্মিল; তিনি অন্ধ হইয়া একটা কূপে পড়িয়া গেলেন।

গোধূলি অতীত হইল; তথাপি উপমন্যু ফিরিলেন না দেখিয়া ধৌম্য ভাবিলেন, আমি তাহার আহারে বাধা দিয়াছি; সেই জন্য, বোধ হয়, সে কুপিত হইয়াছে। তিনি শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া উপমন্যুর অনুসন্ধানে গেলেন এবং মাঠে গিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। উপমন্যু গুরুর স্বর শুনিয়া বলিলেন, "আমি এই কূপের মধ্যে পড়িয়া আছি। আকন্দের পাতা খাইয়াছিলাম; তাহাতে অন্ধ হইয়া আমি এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি।" তখন ধৌম্য বলিলেন, "বৎস, তুমি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব কর। তাঁহারা তুষ্ট হইয়া তোমাকে চক্ষু দান করিবেন।" উপমন্যু ভক্তিসহকারে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার গুরুভক্তি দেখিয়া অশ্বিনীকুমারের

এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা সে আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের বরে উপমন্যু দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলেন এবং গুরুর কৃপায় সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন।

পারিজাত-মালা।

আজ কাশীতে মহা উৎসব; সহস্র সহস্র লোকে উৎসব দেখিতে আসিয়াছে। কোথাও গীতবাদ্য হইতেছে, কোথাও নটেরা সঙ্ সাজিয়া বিকট নৃত্য করিয়া দর্শকদিগকে হাসাইতেছে, কোথাও বাজীকরেরা নিমিষের মধ্যে আঁঠি হইতে আমগাছ জন্মাইয়া তাহাতে ফল ফলাইতেছে, কিংবা এক হাত, দেড় হাত লম্বা তরয়ার গিলিয়া লোকের বিস্ময় জন্মাইতেছে।

এই উৎসব দেখিবার জন্য স্বর্গ হইতে চারি জন দেবপুত্রও আসিলেন। তাঁহাদের রূপ মানুষের মত, গলায় এক একটা পারিজাতমালা। পারিজাত স্বর্গের ফুল; তাহার গন্ধে সমস্ত বারাণসীপুরী আমোদিত হইল, লোকে মোহিত হইয়া উৎসবের কথা ভুলিয়া গেল, এবং কোথা হইতে ঐ গন্ধ আসিতেছে, জানিবার জন্য চারিদিকে তাকাইতে লাগিল।

দেবপুত্রেরা শূন্যে বসিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কাহারা?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "আমরা দেবপুত্র; তোমাদের উৎসব দেখিতে আসিয়াছি।"

"আপনাদের গলায় ওগুলি কি ফুলের মালা?

"পারিজাত ফুলের মালা।"

"দয়া করিয়া আমাদিগকে মালা ক'টী দিন না। দেবলোকে ত এরূপ মালার অভাব নাই কিন্তু নরলোকে যে ইহা কোথাও পাওয়া যায় না।"

"দিতে পারি; কিন্তু যে সে এ মালা পরিতে পারে না; যাহারা ধার্ম্মিক, যাহাদের মনে কোন পাপ নাই, তাহারাই ইহা পরিবার যোগ্য।"

বারাণসী-রাজের পুরোহিত বড় কপট প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি কপালে ভস্মের ত্রিপুণ্ড্রক পরিতেন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করিতেন, মুখে "হর, হর" বলিতেন, কিন্তু তাঁহার না ছিল দয়া, না ছিল দেবভক্তি, না ছিল মিথ্যার ভয়। তিনি স্বস্ত্যয়ন করিবার ছলে রাজার অর্থ শোষণ করিতেন, সাধু-জনের মিথ্যা কলঙ্ক রটাইতেন, অনাহারে মরিতেছে দেখিয়াও ভিখারীকেও মুষ্টিভিক্ষা দিতেন না। দেবপুত্রদিগের কথা শুনিয়া তিনি ভাবিলেন, 'মালা কটি লওয়া যাউক; আমি মালা পরিয়াছি দেখিলে লোকে মনে করিবে, আমি মহাপুণ্যবান্'। মনে মনে ইহা স্থির করিয়া তিনি একজন দেবপুত্রের সম্মুখে গিয়া মালা চাহিলেন। দেবপুত্র বলিলেন,

> "কায়ে যে না করে কভু পরস্ব হরণ,
> বাক্যে যে না করে কভু মিথ্যা আচরণ,
> সৌভাগ্যে প্রমত্ত কভু নাহি হয় যেই,
> এ মালা পরিতে শুধু উপযুক্ত সেই।"

পুরোহিত বলিলেন, "এ সকল গুণই আমাতে আছে।" দেবপুত্র তখন দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার মস্তকে নিজের মালাটী পরাইয়া দিলেন। ইহাতে পুরোহিতের লোভ বাড়িল; তিনি

দ্বিতীয় দেবপুত্রের মালাটী চাহিলেন। দ্বিতীয় দেবপুত্র বলিলেন,

"ধর্ম্ম-পথে চরি করে বিত্ত উপার্জ্জন,
অসাধু উপায়ে নাহি হবে পরধন,
সংযত হইয়া চলে ভোগের সময়,
এ মালা পরিতে সেই উপযুক্ত হয়।"

পুরোহিত বলিলেন, "এ সকল গুণও আমাতে আছে।" তখন দ্বিতীয় দেবপুত্রও নিজের মালাটী তাঁহার মস্তকে পরাইয়া দিলেন। ইহার পর পুরোহিত তৃতীয় দেবপুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইলে তিনি বলিলেন,

"প্রাণপণে করে যেই কর্ত্তব্য পালন,
শ্রদ্ধাসহ পালে যেই সাধুর বচন,
পাইলে সুস্বাদ খাদ্য একা নাহি খায়,
এ মালা তাহার(ই) শুধু শিরে শোভা পায়।"

"এ সকল গুণও আমাতে আছে" বলিয়া পুরোহিত ঐ মালাটীও লাভ করিলেন এবং সর্ব্বশেষে চতুর্থ দেবপুত্রের কাছে তাঁহার মালাটী প্রার্থনা করিলেন। চতুর্থ দেবপুত্র বলিলেন,

"সমক্ষে, পরোক্ষে কিংবা ভ্রমেও কখন
সাধুদের নিন্দাবাদ করে না যে জন,
প্রতিজ্ঞাপালনে কভু কাতর যে নয়,
এ মালা পরিতে সেই উপযুক্ত হয়।"

পুরোহিত উক্ত গুণগুলি স্বীকার করিয়া চতুর্থ মালাটীও প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার পর উৎসব শেষ হইল; দেবপুত্রেরা নরলোক হইতে প্রস্থান করিলেন; এ দিকে পুরোহিতের ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া জন্মিল। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, কামারে যেন হাঁতুড়ির

ঘা দিয়া তাঁহার মাথার মধ্যে শত শত পেরেক পুতিয়া দিতেছে। তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইলেন, এবং ত্রাহি ত্রাহি বলিতে বলিতে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, কি হইয়াছে?" পুরোহিত বলিলেন, "আমাতে যে সকল গুণ নাই, সেগুলি আছে বলিয়া পারিজাত-মালা পাইয়াছি। এখন সে পাপের ফল ভোগ করিতেছি। তোমরা আমার মাথা হইতে মালাগুলি খুলিয়া লও। খুলিয়া লইলে, বোধ হয়, শান্তি পাইব।" কিন্তু মালাগুলি তাহার মাথায় এমন আঁটিয়া গিয়াছিল যে, লোকে টানাটানি করিয়াও খুলিতে পারিল না। তখন তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া আবার উৎসবের আয়োজন করিল; দেবপুত্রেরা আবার উহা দেখিতে আসিলেন; পুরোহিতের আত্মীয়েরা তাঁহাকে দেবপুত্রদিগের সম্মুখে লইয়া উপুড় করিয়া শোওয়াইয়া রাখিলেন; পুরোহিত মিনতি করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার অপরাধ হইয়াছে। আমি মহাপাপী; কিন্তু আর কখনও কুপথে চলিব না। এবার আমায় ক্ষমা করুন।" তিনি প্রকৃতই অনুতপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া দেবপুত্রেরা মালাগুলি খুলিয়া লইলেন এবং বলিয়া দিলেন, "সাবধান, আর কখনও মিথ্যা বলিও না ও কুপথে চলিও না"।

চুরি করিলেই ধরা পড়িতে হয়।

কোন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে একটা টোল ছিল। অনেক ব্রাহ্মণ-বালক ঐ টোলে পড়া শুনা করিত। তাহাদের নিকট বেতন লওয়া দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে খাইতে

পরিতে দিতেন; ব্রাহ্মণী স্বহস্তে পাক করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতেন।

ব্রাহ্মণের একটী কন্যা বিবাহের যোগ্যা হইয়াছিল। তিনি স্থির করিলেন, টোলের ছাত্রদিগের মধ্যে যাহার চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, তাহাকেই কন্যা দান করিবেন। অনন্তর তিনি ছাত্রদিগের চরিত্র-পরীক্ষার জন্য এক অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "বৎসগণ! আমি এত দিন তোমাদিগকে প্রতিপালন করিলাম ও শিক্ষা দিলাম; কিন্তু এখন তোমারা কিছু কিছু আনিয়া না দিলে আমি আর চালাইতে পারিতেছি না। তোমরা আপন আপন বাড়ী যাও, এবং যে যাহা পার, গোপনে আনিয়া আমায় দাও। কিন্তু সাবধান, নিজের বাড়ী ভিন্ন অন্য কাহারও বাড়ী হইতে কোন দ্রব্য লইও না, এবং কেহ যেন এই অপহরণের কথা জানিতে না পারে।"

ছাত্রেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিল এবং দুই এক দিনের মধ্যেই ফিরিয়া অধ্যাপককে নানাবিধ উপহার দিল। কেহ টাকা দিল, কেহ বস্ত্র দিল, কেহ সোণা রূপার অলঙ্কার দিল, কেহ পিতল কাঁসার থালা, ঘটি, বাটি দিল। এক জন ভিন্ন অন্য সকলেই এইরূপে কিছু না কিছু আনয়ন করিল। যে কিছুই দিল না, ব্রাহ্মণ সেই ছেলেটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কিছু আনিলে না, বাবা?" সে বলিল, "গুরুদেব, আপনি বলিয়াছিলেন, এমনভাবে আনিতে হইবে যে, কেহ যেন না জানিতে পারে। কিন্তু আমি দেখিলাম, কোন কাজই গোপনে করা যায় না।

"কোন পাপ এ জগতে না থাকে গোপন
অরণ্যে রয়েছে সাক্ষী বনাজীবগণ।
মূর্খ যেই, সেই পাপ করি হেন স্থানে,
ভাবে মনে, নাহি কারো সাধ্য ইহা জানে।

গোপন কুত্রাপি আমি না পাই দেখিতে ;
গোপন বলিয়া কিছু নাহি পৃথিবীতে।
অন্যে না থাকুক, আমি রয়েছি যখন,
কেমনে এমন স্থান বলিব নির্জ্জন ?"

ছাত্রটীর উত্তর শুনিয়া ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, চরিত্রগুণে সেই সকলের শ্রেষ্ঠ। অন্য ছাত্রেরা যে সকল দ্রব্য আনিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে সেগুলি স্ব স্ব গৃহে লইয়া যাইতে বলিলেন, এবং শুভদিন দেখিয়া ঐ ছাত্রটীরই সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন।

দণ্ডভোগ না করিলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

শঙ্খ ও লিখিত দুই সহোদর, ইঁহারা কোন নদীর ধারে দুইটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তপস্যা করিতেন। আশ্রম দুইটী তরু, লতা, ফল, ফুলের শোভায় পরম রমণীয় ছিল।

একদা লিখিত শঙ্খের আশ্রমে গিয়াছিলেন। শঙ্খ তখন আশ্রমে ছিলেন না। লিখিত বৃক্ষ হইতে কয়েকটী ফল পাড়িয়া খাইতে লাগিলেন। এই সময়ে শঙ্খ ফিরিয়া আসিলেন এবং লিখিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি এই সকল ফল কোথায় পাইলে ?" লিখিত বলিলেন, "দাদা, আমি আপনার আশ্রম হইতেই এই সকল ফল লইয়াছি।" তখন শঙ্খ ক্রোধের ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি আমার অগোচরে ফল

লইয়াছ; অতএব তুমি চুরি করিয়াছ। তুমি এখনই রাজার নিকটে গিয়া নিজের দোষ জানাও এবং উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ কর।"

লিখিত "যে আজ্ঞা" বলিয়া রাজভবনে গমন করিলেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন এবং প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভগবন্! কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন, বলুন। আমি এখনই আপনার আদেশ পালন করিতেছি।" লিখিত বলিলেন, "মহারাজ, আপনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমার আদেশ পালন করিবেন। আমার আদেশ কি শুনুন। আমি আমার অগ্রজের আশ্রম হইতে ফল চুরি করিয়াছি। অতএব আমাকে অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড দিন।" রাজা কহিলেন, "আমি শাস্ত্রানুসারে অপরাধীকে দণ্ড দিতে পারি, ক্ষমাও করিতে পারি। আপনি তপস্বী ও ধার্ম্মিক। আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম।"

কিন্তু লিখিত ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি পুনঃ পুনঃ দণ্ডই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাজা দেখিলেন, দণ্ড না দিলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। কাজেই তিনি দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিলেন। তখন চোরের বাহুদ্বয় ছেদন করিবার প্রথা ছিল। রাজা সেই প্রথা স্মরণ করিয়া লিখিতের বাহু দুইখানি ছেদন করাইলেন।

লিখিত রাজদণ্ড ভোগ করিয়া অগ্রজের নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং ছিন্ন বাহু দেখাইয়া বলিলেন, "দেখুন, দাদা, রাজা আমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছেন। এখন আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" শঙ্খ বলিলেন, 'ভাই, আমি তোমার প্রতি কুপিত হই নাই; তুমি

ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করিয়াছিলে বলিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলাম। এখন তুমি নদীতে গিয়া স্নান ও তর্পণ কর।"

লিখিত নদীতে গিয়া স্নান করিলেন এবং অভ্যাসবশতঃ যেমন তর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি তাঁহার নূতন বাহুদ্বয় উৎপন্ন হইল। ইহাতে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া তিনি শঙ্খকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শঙ্খ বলিলেন, "ভাই, আমার আশীর্ব্বাদেই তুমি আবার বাহু দুইখানি পাইয়াছ।" ইহা শুনিয়া লিখিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দাদা, আপনার আশীর্ব্বাদের যখন এমন বল, তখন আমাকে রাজার নিকট না পাঠাইয়া আপনিই কেন পাপমুক্ত করিলেন না?" শঙ্খ বলিলেন, "ভাই, দণ্ডভোগ না করিলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। দণ্ড দিবার কর্ত্তা রাজা। আমি কে, যে, তোমার দণ্ডবিধান করিব? তুমি রাজদণ্ড ভোগ করিয়াছ; অতএব তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।"

লিখিত যে নদীতে স্নান করিয়া বাহু দুইখানি ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, ঐ সময় হইতে তাহার নাম 'বাহুদা' হইয়াছে।

গজ-কচ্ছপের কথা।

বিভাবসু ও সুপ্রতীক-নামক দুই সহোদর ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন এবং নানা বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু উভয়েই যখন গৃহস্থ হইলেন, তখন সুপ্রতীক জ্যেষ্ঠের সহিত একান্নে থাকিতে চাহিলেন না। বিভাবসু তাঁহাকে কত বুঝাইলেন,—বলিলেন, "দেখ, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হওয়া ভাল নয়। আমরা এক মাতাপিতার সন্তান, এক গৃহে জন্মিয়াছি,

একইরূপ স্নেহ মমতা পাইয়াছি, একসঙ্গে লালিত পালিত হই-য়াছি। কিন্তু এখন যদি পৃথক্ হই, তবে কুচক্রী লোকে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবে, ধনভাগ লইয়া বিবাদ হইবে. 'আমরা একে অপরের শত্রু হইব"। সুপ্রতীক এ কথায় কাণ দিলেন না; তিনি পৈতৃক ধন ভাগ করিয়া লইবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন।

ইহার পর, বিভাবসু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। দুই সহোদর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন : সে বিবাদ ক্রমে বাড়িতে লাগিল ; দুই জনেই যতদিন জীবিত রহিলেন, পরস্পরের অনিষ্টাচরণ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। অধিকন্তু সেই পাপের ফলে মৃত্যুর পর সুপ্রতীক হইলেন একটা প্রকাণ্ড হস্তী এবং বিভাবসু হইলেন একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ।

বিভাবসু কচ্ছপ হইয়া কোন সরোবরে বাস করিতেন। উহার অদূরে একটা বন ছিল গজরূপী সুপ্রতীকের চরিবার স্থান। সুপ্রতীক যখন সরোবরে জল পান করিতে যাইতেন, তখন বিভাবসু পূর্ব্বজন্মের শত্রুতার প্রভাবে তাঁহার পা কামড়াইয়া ধরিতেন। এইরূপে প্রায় প্রতিদিন গজ-কচ্ছপে মহাযুদ্ধ হইত। গজ শুণ্ড দ্বারা কচ্ছপকে প্রহার করিত, কচ্ছপও গজকে টানিয়া জলে ডুবাইতে চেষ্টা করিত। যতক্ষণ উভয়ে নিতান্ত ক্লান্ত না হইত ততক্ষণ কেহই নিরস্ত হইত না।

গজকচ্ছপের এই ভীষণ যুদ্ধ বহুকাল চলিয়াছিল। শেষে এক অদ্ভুত উপায়ে ইহার অবসান হয়। কশ্যপ ঋষির বিনতা-নাম্নী এক পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে পক্ষিরাজ গরুড় জন্ম-

গ্রহণ করিয়াছিলেন। গরুড় যখন অণ্ড ভেদ করিয়া বাহির হন; তখনই তাঁহার তেজ দেখিয়া দেবতারা পর্য্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। এই গরুড় এক দিন অমৃত আনিবার জন্য স্বর্গে যাইতেছিলেন ; পথে ক্ষুধায় কাতর হইয়া তিনি কশ্যপের নিকট গিয়া বলিলেন, "বাবা, বড় খিদে পেয়েছে ; কি খাব, বলুন।" কশ্যপ দেখিলেন, গরুড়ের ক্ষুধা অল্পে স্বল্পে নিবৃত্ত হইবে না। তিনি বলিলেন, "বৎস, অমুক সরোবরে যাও ; সেখানে একটা প্রকাণ্ড গজ ও একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ দেখিতে পাইবে। তুমি আজিকার মত সেই দুইটা খাইয়া জলযোগ কর।" গরুড় "যে আজ্ঞা" বলিয়া সেই সরোবরে গেলেন। গজ-কচ্ছপ তখন মহাযুদ্ধে মাতিয়াছিল ; তাহারা গরুড়কে দেখিয়াও দেখিতে পাইল না। গরুড় ছোঁ মারিয়া দুইটাকে দুই নখে তুলিয়া লইলেন এবং একটা পর্ব্বতশৃঙ্গে বসিয়া তাহাদিগকে উদরস্থ করিলেন।

অসাধুতার পরিণাম।

একদা এক সাধু ফেরিওয়ালা ও এক অসাধু ফেরিওয়ালা নানাবিধ দ্রব্য লইয়া নদী পার হইয়া কোন নগরে ফেরি করিতে গিয়াছিল। ঐ নগরে পূর্ব্বে এক ধনী বণিক্ বাস করিতেন ; কিন্তু কমলার কোপে পড়িয়া তাঁহার ধননাশ হয় ; বাড়ীর পুরুষেরাও একে একে মরিয়া যায়। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন তাঁহার বংশে কেবল একটী বালিকা ও তাহার বৃদ্ধা পিতামহী জীবিত ছিলেন। তাঁহারা প্রতিবেশীদিগের গৃহে কাজকর্ম্ম করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতেন।

তাঁহাদের বাড়ীতে একখানি সোণার ভাঙ্গা বাসন ছিল। বাড়ীর কর্ত্তা সৌভাগ্যের সময়ে ঐ পাত্রে ভোজন করিতেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যবহৃত না হওয়ায় উহার উপর এত ময়লা জমিয়াছিল যে, সহসা উহা সোণার বলিয়া বোধ হইত না।

"চুড়ি চাই, খেলানা চাই" বলিয়া হাঁকিতে হাঁকিতে অসাধু ফেরিওয়ালা ঐ বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল। তাহা শুনিয়া বালিকাটী বৃদ্ধাকে বলিল, "আমায় একটা খেল্‌না কিনে দাও না, ঠাকুর মা!" বৃদ্ধা বলিলেন, "পয়সা পাব কোথায়, বাছা?" তখন বালিকা সেই ভাঙ্গা বাসনখানি আনিয়া বলিল, "এটা বদল দিলে হয় না? ইহা ত আমাদের কোন কাজে লাগে না।" বৃদ্ধা ফেরিওয়ালাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপু, ইহার বদলে আমার নাতিনীকে একটা খেল্‌না দিতে পার কি?"

বাসনখানি দুই একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ফেরিওয়ালার সন্দেহ হইল; সে উহার পিঠে একটা দাগ কাটিল, এবং যখন বুঝিল, উহা সোণার, তখন মেয়েমানুষ দুইজনকে ঠকাইবার জন্য বলিল, "এর আবার দাম কি? ইহা এক পয়সায় কিন্‌লেও ঠকা হয়।" সে নিতান্ত অবজ্ঞার ভাণ দেখাইয়া বাসনখানি ফেলিয়া দিল এবং সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

ইহার পর সাধু ফেরিওয়ালাও ফেরি করিতে করিতে সেখানে আসিল এবং বালিকা এবারও একটা খেল্‌না কিনিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। বৃদ্ধা বলিলেন, "যে বাসন বদল দিতে চাহিতেছিলি, তার ত কোন দামই নাই শুন্‌লি।" বালিকা বলিল, "সে ফেরিওয়ালা বড় খারাপ লোক। এ

লোকটা বোধ হয়, ভাল হবে। শুন না, এর গলা কেমন মিষ্টি।" বৃদ্ধা দায়ে পড়িয়া সাধু ফেরিওয়ালাকেও ডাকাইলেন এবং বাসনখানি তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর বদলে একটা খেল্না দিতে পার কি, বাবা?" সাধু ফেরিওয়ালা বাসনখানি হাতে লইয়াই বুঝিল, উহা সোণার। সে বৃদ্ধাকে বলিল, "মা, এ সোণার বাসন, এর দাম পাঁচ ছয় হাজার টাকা; আমার কাছে এত টাকা নাই; থাক্‌লে কিনে নিতাম।" বৃদ্ধা বলিলেন, "এই মাত্র আর এক ফেরিওয়ালা এসেছিল; সে বল্‌ল, এর দাম এক পয়সাও নয়। তোমারই পুণ্যবলে এখন ইহা সোণা হয়েছে, বাবা! আমরা এটা তোমাকেই দিব; তুমি যা' পার, তা'ই দাও।"

সাধু ফেরিওয়ালার নিকট তখন জিনিষে ও নগদে এক হাজার টাকা ছিল। সে উহা হইতে আট আনা মাত্র রাখিয়া আর সমস্ত বৃদ্ধাকে দিল এবং বাসনখানি লইয়া যত শীঘ্র পারিল, নদীর তীরে উপস্থিত হইল। সেখানে একখানা নৌকা ছিল; সে মাঝির হাতে সেই আট আনা দিয়া বলিল, "আমাকে এখনই পার করে দাও।"

এদিকে অসাধু ফেরিওয়ালা সেই বৃদ্ধার বাড়ীতে ফিরিল এবং আবার বাসনখানি দেখিতে চাহিল। সে বলিল, "ভেবে দেখ্‌লাম, এর বদলে তোমাদিগকে একেবারে কিছু না দিলে ভাল দেখায় না।" বৃদ্ধা বলিলেন, "সে কি কথা, বাপু? তুমি না বল্‌লে, উহার দাম এক পয়সাও নয়! কিন্তু এইমাত্র আর একজন ফেরিওয়ালা উহা হাজার টাকায় কিনে নিয়েছেন। হাঁ বাবা, তিনি বুঝি তোমার মনিব?

বৃদ্ধার কথায় অসাধু ফেরিওয়ালার মাথা ঘুরিয়া গেল। সে পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল; তাহার টাকা কড়ি ও পণ্যদ্রব্যগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। "হায়, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! ব্যাটা পাঁচ ছয় হাজার সোণার বাসন হাজার টাকায় নিয়ে পালিয়েছে", এইরূপ প্রলাপ করিতে করিতে, সে সাধু ফেরিওয়ালাকে ধরিবার উদ্দেশ্যে নদীর দিকে ছুটিল। সেখানে গিয়া দেখে, নৌকাখানি তখন নদীর মাঝখানে গিয়াছে। সে "নৌকা ফিরাও", "নৌকা ফিরাও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; কিন্তু মাঝি নৌকা ফিরাইল না। সাধু ফেরিওয়ালা ক্রমে নদীর অপর পারে উপনীত হইল, অসাধু ফেরিওয়ালা একদৃষ্টিতে তাহা দেখিতে লাগিল। অনন্তর, জলহীন পুষ্করিণীর তলদেশ যেমন রৌদ্রে ফাটিয়া চৌচার হয়, বিষম দুঃখে তাহার কলিজাটাও সেইরূপ ফাটিয়া গেল; সে রক্ত বমন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল।

স্বেচ্ছায় অপরাধ-স্বীকার।

রামচন্দ্রের পিতা দশরথ শব্দবেধী ছিলেন, অর্থাৎ তিনি কোন প্রাণীর শব্দ শুনিলে, তাহাকে না দেখিয়াও এমনভাবে শর নিক্ষেপ করিতে পারিতেন যে, ঐ প্রাণী তাহাতে বিদ্ধ হইত।

একদা সন্ধ্যার পর যখন অন্ধকার গাঢ় হইল, তখন দশরথ ধনুর্ব্বাণ লইয়া সরযূ নদীর তীরস্থ একটা বনে মৃগয়া করিতে গেলেন। সেই সময়ে এক মুনিবালক নদীর ঘাটে জল আনিতে গিয়াছিলেন। তিনি জল পূরিবার জন্য কলসীটা ডুবাইলে উহা হইতে বায়ু বাহির হইবার কালে শব্দ হইল; দশরথ উহা শুনিয়া

মনে করিলেন, একটা হস্তিশাবক ডাকিতেছে। তিনি ঐ শব্দ লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িলেন; উহা মুনিবালকের বুকে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল।

মুনিবালক আহত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "কে হে আমায় এই দারুণ প্রহার করিলে? আমি ত ভ্রমেও কাহারও অনিষ্ট করি নাই। আমাকে মারিয়া কি ফল পাইলে, বল ত? হায় আমার জরাজীর্ণ অন্ধ মাতাপিতার কি গতি হইবে? আমি যে তাঁহাদের একমাত্র সন্তান। কে তাঁহাদিগকে পিপাসায় জল ও ক্ষুধায় অন্ন দিবে? আহা! আজ এই একটা বাণে আমাদের তিনজনেরই জীবনান্ত হইল।"

মুনিবালকের এই বিলাপ শুনিয়া দশরথ যেন বজ্রাহত হইলেন। 'হায় কি করিলাম! হস্তিভ্রমে আমি মনুষ্য বধ করিলাম,' ইহা ভাবিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তিনি সেখানে ছুটিয়া গেলেন এবং দেখিতে পাইলেন, মুনিবালকটী শরবিদ্ধ হইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। দশরথকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমি কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে, আপনি আমার প্রাণান্ত করিলেন? অথবা আপনাকে দোষ দিতে পারি না, কারণ ইহা আপনার অজ্ঞানকৃত কার্য্য। যাহা হউক, আপনি অগ্রে আমার বুক হইতে বাণটা খুলিয়া লউন, কারণ ইহা আমাকে দুঃসহ যন্ত্রণা দিতেছে। তাহার পর জলের কলসীটা লইয়া, ঐ যে একপেয়ে পথটী দেখিতেছেন, ঐ পথে আমাদের আশ্রমে যান। সেখানে আমার মাতাপিতা আছেন। তাঁহাদিগকে এই দুঃসংবাদ দিবেন।"

দশরথ মুনিবালকের বুক হইতে শরটা টানিয়া বাহির করিলেন; অমনি রক্তের ধারা ছুটিল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। অনন্তর দশরথ কলসীটী জলপূর্ণ করিয়া আশ্রমে গেলেন। তাঁহার পদশব্দ শুনিয়া বৃদ্ধ মনে করিলেন, পুত্র ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি বলিলেন, "বৎস! তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? তোমার বিলম্ব দেখিয়া আমরা বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। তুমি যে আমাদের অন্ধের যষ্টি। তোমার সেবা না পাইলে আমাদের একদিনও বাঁচিবার উপায় নাই।"

বৃদ্ধের ভ্রম দেখিয়া ও বিলাপ শুনিয়া দশরথের অনুতাপ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। তিনি ইচ্ছা করিলে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে কিছুই না বলিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন; কেহই তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া জানিতে পারিত না। কিন্তু তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার নিকট গেলেন এবং কিছু মাত্র গোপন না করিয়া, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, অতি বিনীতভাবে সমস্ত নিবেদন করিলেন। তাঁহারা শুনিয়া কিয়ৎকাল বিলাপ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "যা' হবার, হয়েছে; যেখানে আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব পড়িয়া আছে, এখন আমাদিগকে সেইখানে লইয়া চল। আমরা এ জীবনের মত একবার তাহার দেহ স্পর্শ করিব।"

দশরথ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহারা মৃত পুত্রের গায়ে হাত বুলাইয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি সদ্‌গতি লাভ কর।" অনন্তর মৃতদেহের সৎকার করিয়া তাঁহারা প্রেতের উদ্দেশে তর্পণ করিলেন। অমনি স্বর্গ

হইতে রথ আসিল ; মৃত মুনিবালকের আত্মা দিব্য দেহ ধারণ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিল এবং যাইবার সময়ে বলিয়া গেল, "আমি কায়মনোবাক্যে আপনাদের সেবা করিয়াছিলাম। সেই পুণ্যে এবং আপনাদের আশীর্ব্বাদে এখন স্বর্গসুখ ভোগ করিতে চলিলাম। আপনারা আমার জন্য শোক করিবেন না।" কিন্তু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দেখিলেন, জীবন তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত দুর্ব্বহ। তাঁহারাও অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে প্রাণত্যাগ করিবার আয়োজন করিলেন। চিতায় আরোহণ করিবার কালে তাঁহারা দশরথকে শাপ দিলেন, "আজ পুত্রশোকে আমাদের যে দশা ঘটিল, তোমারও যেন সেই দশা হয়।"

দ্রোণ ও দ্রুপদের কথা।

(১) অপমান।

"মা, আজ আমি দুধ খাবই খাব। শেঠদের ছেলেরা বাটি বাটি দুধ খায় ; আমি তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি। তা'রা হাসে, আর বলে, দুধ কেমন তা জানিস্ ?" গঙ্গাতীরে এক তপস্বীর আশ্রমে একটী শিশু একদিন তাহার জননীর নিকট এইরূপ অথট্টি * করিতেছিল। ছেলেটীর নাম অশ্বত্থামা ; তাহার পিতার নাম দ্রোণ ও মাতার নাম কৃপী।

ছেলের কথায় মায়ের চোখে জল আসিল। তিনি স্বামীকে

* ইহা হইতে 'আথ'ট' শব্দ হইয়াছে। কোন কোন জেলায় 'আথ'ট' শব্দের প্রচলন আছে। কলিকাতা অঞ্চলে 'বায়না' শব্দটা এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ছেলের আবদার জানাইলেন। দ্রোণ দরিদ্র; তিনি একটু দুধের জন্য বহু চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোথাও পাইলেন না।

এদিকে কয়েকটা দুষ্ট ছেলে আশ্রমে আসিয়া জুটিয়াছিল। তাহারা অশ্বত্থামাকে পিটালি-গোলা জল দিয়া বলিল, "এই দুধ খা।" অশ্বত্থামা উহাই পান করিয়া 'আমি দুধ খাইয়াছি' বলিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিল। ইহাতে দুষ্ট ছেলেগুলা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। দ্রোণ আশ্রমে ফিরিয়া এই কাণ্ড দেখিতে পাইলেন।

উত্তর-পঞ্চালের রাজা পৃষতের পুত্র দ্রুপদ দ্রোণের সমবয়স্ক ছিলেন। তিনি ও দ্রোণ শৈশবে একসঙ্গে ক্রীড়া করিতেন এবং বহুদিন এক গুরুর গৃহে থাকিয়া ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত উভয়ের মধ্যে গাঢ় প্রণয় জন্মিয়াছিল। দ্রুপদ অনেক সময়ে বলিতেন, "ভাই দ্রোণ, আমি শপথ করিতেছি, যখন রাজা হইব, তখন তোমাকে অর্দ্ধরাজ্য দান করিব।"

কালে দ্রোণের পিতার মৃত্যু হইল, দ্রোণ আশ্রমে ফিরিয়া তপস্যা ও শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পরসেবা ভাল-বাসিতেন না, পরের অনুগ্রহ ভোগ করাও অপমানকর বলিয়া মনে করিতেন। তিনি অতি কষ্টে শাকান্ন সংগ্রহ করিয়া পরিজন পালন করিতেন; তথাপি এতদিন দ্রুপদের নিকট কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। আজ কিন্তু পুত্রের দুর্দ্দশায় এবং তাহার বয়স্যদিগের পরিহাসে দ্রোণের বড় দুঃখ হইল। তিনি দ্রুপদের সাহায্য পাইবার আশায় উত্তর-পঞ্চালে যাত্রা করিলেন।

দ্রোণ পথিমধ্যে শুনিলেন যে, পৃষতের মৃত্যু হইয়াছে এবং

তাঁহার সখা দ্রুপদই এখন উত্তরপঞ্চালের রাজপদ লাভ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার আশা আরও বলবতী হইল। কিন্তু রাজভবনে গিয়া তিনি বিপরীত ফল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি যখন বলিলেন, "সখে, আমি নিতান্ত অভাবে পড়িয়া তোমাকে পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইতে আসিয়াছি; এখন আমাকে অর্দ্ধরাজ্য দান কর", তখন ঐশ্বর্য্যমত্ত দ্রুপদ অতি অবজ্ঞার সহিত উত্তর দিলেন, "তোমার ত বড় আস্পর্দ্ধা! তুমি ভিখারী হইয়া আমার মত একজন প্রধান ভূপতিকে সখা বলিয়া সম্বোধন করিতেছ। তুমি কি জান না যে, সমানে সমানেই বন্ধুতা হয়; রাজা না হইলে কেহ রাজার বন্ধু হইতে পারে না? শৈশবে কখন কি কথা হইয়াছিল, তাহা এখন ভুলিতে হইবে। তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ; এক রাত্রির মত এখানে আহার কর; প্রভাতে যেন কেহ তোমাকে এখানে দেখিতে না পায়।"

দ্রুপদের কটূক্তি শুনিয়া ক্রোধে ও অভিমানে দ্রোণের সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। 'যেরূপে পারি, এই দাম্ভিকের দর্প চূর্ণ করিব,' মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি তদ্দণ্ডেই দ্রুপদের রাজধানী ত্যাগ করিয়া গেলেন।

(২) প্রতিশোধের আয়োজন।

হস্তিনাপুরের কতকগুলি ক্ষত্রিয়বালক একদা রাজভবনের পুরোভাগে একটা জলশূন্য কূপের ধারে একটী লৌহগুলিকা লইয়া খেলা করিতেছিল। দৈবাৎ গুলিকাটা কূপের ভিতর পড়িয়া গেল। বালকেরা উহা তুলিবার জন্য কত চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

ঐ সময়ে সেখান দিয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাইতেছিলেন। তিনি বালকদিগকে নিরুৎসাহ দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা না ক্ষত্রিয়-কুমার! অথচ কেহই গুলিকাটী তুলিতে পারিতেছ না! দেখ, এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমাদের গুলিকা তুলিয়া দিতেছে। কেবল গুলিকা কেন? আমার অঙ্গুরীয়কটী কূপে ফেলিয়া দিলাম; আমি এইখানে দাঁড়াইয়াই এই দুই দ্রব্য উদ্ধার করিব।" বালকদিগের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সে বলিল, "ইহা যদি পারেন তবে আপনি রাজবাড়ী হইতে চিরকাল ভিক্ষা পাইবেন।" ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে এক মুষ্টি বাণ হস্তে লইলেন, প্রথমে একটী বাণ নিক্ষেপ করিয়া গুলিকাটী বিদ্ধ করিলেন, তাহার পর আর একটী বাণে প্রথম বাণটী বিদ্ধ করিলেন; এইরূপে বাণগুলি পর পর বিদ্ধ করিয়া তিনি উপরে দাঁড়াইয়াই গুলিকাটী টানিয়া তুলিলেন। অনন্তর তিনি উক্ত উপায়ে অঙ্গুরীয়কটীও উদ্ধার করিলেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ক্ষমতা দেখিয়া বালকেরা অতিমাত্র বিস্মিত হইল। তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনি সামান্য ব্যক্তি নহেন। দয়া করিয়া নিজের পরিচয় দিন।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বৎসগণ, তোমরা গিয়া ভীষ্মকে এই বৃত্তান্ত বল। তিনি আমায় জানেন।"

ভীষ্ম হস্তিনাপুরের রাজকুমারদিগের পিতামহ। তিনি একটা প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া কখনও বিবাহ করেন নাই। তাঁহার ভ্রাতারা অনেক দিন হইল মারা গিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। পাণ্ডুও মারা গিয়াছিলেন; ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ

বলিয়া রাজা হইতে পারেন নাই। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ইত্যাদি একশত পুত্র; যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, এই পাঁচজন পাণ্ডুর পুত্র। লোকে দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে কৌরব এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচজনকে পাণ্ডব বলিত। ভীষ্ম ইঁহাদের সকলেরই রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। উপরে যে বালকদিগের কথা বলা হইল, তাঁহারা এই সকল রাজকুমার। সে কালে ক্ষত্রিয়-বালকদিগকে অতি যত্নসহকারে অস্ত্রবিদ্যা শিখিতে হইত। রাজকুমারদিগের শিক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, ভীষ্ম একজন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিবার কথা ভাবিতেছিলেন।

রাজকুমারেরা ভীষ্মের নিকটে গিয়া গুলিকার উদ্ধার-বৃত্তান্ত বলিলেন। তিনি শুনিয়া বুঝিলেন, দ্রোণ ভিন্ন অন্য কেহ এমন অলৌকিক অস্ত্রনৈপুণ্য দেখাইতে পারেন না। যে দ্রোণ তখন অস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয়, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে হস্তিনাপুরে আসিয়াছেন জানিয়া ভীষ্ম নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং তখনই তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে কুমারদিগের আচার্য্যের পদে বরণ করিলেন।

দ্রোণ কুমারদিগকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে উত্তমরূপে অস্ত্র শিক্ষা দিব; কিন্তু তোমাদিগকে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, শিক্ষা শেষ হইলে তোমরা আমার অভিলষিত একটী কাজ করিবে।" দুর্য্যোধন প্রভৃতি অনেকেই এই প্রস্তাব শুনিয়া নিরুত্তর রহিলেন; কিন্তু অর্জ্জুন বলিলেন, "আপনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই পালন করিব।"

শিক্ষায় অনুরাগ, গুরুর প্রতি ভক্তি ইত্যাদি বহুগুণে অর্জ্জুন

অচিরে আচার্য্যের প্রধান প্রিয়পাত্র হইলেন। তিনি একমনে আচার্য্যের উপদেশ শুনিতেন; যখন অন্য বালকেরা বৃথা সময় কাটাইত, তখনও তিনি অস্ত্রচালনা অভ্যাস করিতেন। এই নিমিত্ত আচার্য্যও তাঁহাকে উৎসাহের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, অর্জ্জুনকে ধনুর্ব্বিদ্যায় অদ্বিতীয় করিবেন।

একদিন দ্রোণ ছাত্রদিগের পরীক্ষার জন্য একটা মাটির পাখী নির্ম্মাণ করাইয়া কোন বৃক্ষের অগ্রশাখায় বান্ধিয়া রাখিলেন এবং কুমারদিগকে বলিলেন, "তোমরা একে একে ধনুর্ব্বাণ লইয়া দাঁড়াও; আমি যখন বলিব, তখন বাণ নিক্ষেপ করিয়া ঐ পক্ষীটার মস্তক ছেদন করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথম যুধিষ্ঠির পরীক্ষা দিতে গেলেন। তিনি লক্ষ্য স্থির করিয়া দাঁড়াইলে, দ্রোণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি দেখিতেছ?" যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন "আমি বৃক্ষকে, আপনাকে, ভ্রাতাদিগকে ও ঐ পক্ষীটাকে দেখিতেছি।" ইহাতে দ্রোণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যাও, এ লক্ষ্য বেধ করা তোমার কাজ নয়।" তাহার পর তিনি দুর্য্যোধন প্রভৃতিকেও পর্য্যায়ক্রমে ঐ প্রশ্ন করিলেন; কিন্তু আচার্য্যের মনের মত উত্তর দিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহারাও তিরস্কৃত হইলেন। পরিশেষে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য বেধ করিতে বলা হইল। তিনি বৃক্ষের নীচে দাঁড়াইলে, আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ, বল।" অর্জ্জুন বলিলেন, "কেবল পাখীটা দেখিতেছি; আর কিছু দেখিতেছি না।" আচার্য্য আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমস্ত পাখীটা দেখিতেছ কি?"

অর্জ্জুন উত্তর দিলেন, 'না, আচার্য্য! আমি কেবল উহার মস্তকটা দেখিতেছি।" তখন আচার্য্য অনুমতি দিলেন, "তবে এখন শর নিক্ষেপ কর।" অর্জ্জুন শর নিক্ষেপ করিলেন; পক্ষীটার মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

(৩) প্রতিশোধ।

হস্তিনাপুরের রাজকুমারেরা অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হইয়াছেন; এখন তাঁহাদের গুরুদক্ষিণা দিবার সময় উপস্থিত। সে কালে এই নিয়ম ছিল যে, শিক্ষা শেষ হইলে আচার্য্য যাহা চাহিতেন, শিষ্যেরা সাধ্যমত তাহাই দিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিত। এই দানের নাম ছিল গুরুদক্ষিণা।

দ্রোণ শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা পঞ্চালরাজ দ্রুপদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া আন। ইহাই তোমাদের গুরুদক্ষিণা; আমি অন্য দক্ষিণা চাই না।"

শিষ্যেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তখনই অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইলেন; দ্রোণ নিজেও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন।

পঞ্চালবাসীরা পরাস্ত হইল; দ্রুপদ বন্দিভাবে দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে আনীত হইলেন। দ্রোণ কহিলেন, "কেমন, মহারাজ! আপনি যে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত দূর করিয়া দিয়াছিলেন, আজ আপনার ধনমানপ্রাণ তাহারই অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে কি না? আপনি আমাকে সখা বলিতে অপমান বোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ; বিশেষতঃ

আপনার সহিত শৈশবে ক্রীড়া করিয়াছিলাম এবং এক গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। অতএব আমি আপনাকে সখাই বলিব। তবে আপনি বলিয়াছিলেন, রাজা ভিন্ন আর কেহ রাজার সখা হইতে পারে না। অতএব আমি আপনার অর্দ্ধ রাজ্য গ্রহণ করিলাম; অপর অর্দ্ধ আপনাকে ছাড়িয়া দিলাম। বলুন ত, এ প্রস্তাবে আপনি সম্মত আছেন কি না এবং এখন হইতে আমাকে সখা বলিবেন কি না?"

দ্রুপদ আর কি উত্তর দিবেন? তিনি অতি দীনভাবে বলিলেন, "আপনি মহাশয়; আপনি যেন এখন হইতে আমার উপর প্রসন্ন হন।"

অনন্তর দ্রোণ স্বহস্তে দ্রুপদের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্যের দক্ষিণ অর্দ্ধ দান করিয়া উত্তর অর্দ্ধ নিজে গ্রহণ করিলেন।

একলব্য।

[বনভূমি; মৃত্তিকার বেদির উপর এক কৃশাঙ্গ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতিমূর্ত্তি; তাহার পার্শ্বে ধনুর্ব্বাণহস্তে একলব্য]

একলব্য। কুকুরটা কি জব্দই হইয়াছে! উহার বিকট রবে কাণ ঝালাপালা হইতেছিল; কোন কাজে মন স্থির করিতে পারিতেছিলাম না; ভাবিলাম, এতদিন যে শব্দবেধ-বিদ্যা অভ্যাস করিতেছি, তাহা পরীক্ষা দেখি। কুকুরটার মুখ বন্ধ করিবার জন্য শব্দ লক্ষ্য করিয়া একে একে সাতটা তীর ছুড়িলাম। একটা না একটা নিশ্চয় লাগিয়াছে; নচেৎ ডাক

শুনা যাইত। তীরগুলার ফলা ছিল না; কাজেই কুকুরটার মুখে কোন ক্ষত হইবার আশঙ্কা নাই।

(ধনুর্ব্বাণহস্তে অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। (স্বগত) তবে কি এই ব্যক্তিই শর নিক্ষেপ করিয়া কুকুরটার মুখ বন্ধ করিয়াছে! কত খুঁজিলাম, এ বনে ত আমাদের লোক ছাড়া অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, আমার অনুমান সত্য কি না। (প্রকাশ্যে) মহাশয়, আমরা এই বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলাম। কে যেন সাতটা শর দিয়া আমাদের একটা কুকুরের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আপনি বলিতে পারেন এ বনে এমন কে আছেন, যিনি ধনুর্ব্বিদ্যায় এরূপ অসামান্য নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন? একটা শর লাগিলেই ত কুকুরটার মুখ বন্ধ হইবার কথা; কিন্তু যিনি এই শরগুলি নিক্ষেপ করিয়াছেন, তিনি এমনই লঘুহস্ত যে, কুকুরটার মুখ বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই আরও ছয়টা শর গিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে!

একলব্য। (সহাস্যে) কুকুরটার মুখে সাতটা শরই লাগিয়াছে! (সলজ্জভাবে) মহাশয়, কুকুরটা বিকটরবে আমায় বড় বিরক্ত করিতেছিল। তাই আমি উহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য শব্দ লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। ইহাতে যদি আপনি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আর যদি ধৃষ্টতা মাপ করেন, তবে আপনার পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করি।

অর্জ্জুন। আমার নাম অর্জ্জুন ; নিবাস হস্তিনাপুরে।

একলব্য। (নমস্কার করিয়া) আজ আমার সুপ্রভাত! যিনি দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়তম শিষ্য এবং ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য, তিনি অযাচিতভাবে দর্শন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিলেন।

অর্জ্জুন। এখন অনুগ্রহ করিয়া নিজের পরিচয়টা দিন্।

একলব্য। রাজকুমার, এ অধমের পরিচয় পাইলে আপনি তাহাকে ঘৃণা কবিবেন কি না, জানি না। আমার জন্ম নিষাদ-কুলে, নাম একলব্য। তবে, আপনার অনুগ্রহ-লাভে আমার যে কিছু অধিকার না আছে, ইহা বলিতে পারি না, কারণ আমরা উভয়েই এক গুরুর শিষ্য।

অর্জ্জুন। যে পরিচয় পাইলাম, তাহাতে ঘৃণার কোন কারণ নাই, বরং শ্রদ্ধার হেতুই যথেষ্ট আছে। আপনি নিষাদকুলে জন্মিয়া এবং এই জনহীন বনে বাস করিয়া যে বিদ্যা লাভ করিয়াছেন, রাজপুত্রেরা শত শত আচার্য্যের উপদেশ পাইয়াও তাহার অধিকারী হইতে পারেন না। জন্ম দৈবায়ত্ত ; নীচকুলে জন্ম একটা অপরাধ নহে ; পক্ষান্তরে বিদ্যা নিজায়ত্ত। আপনি যে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনি সকলেরই প্রশংসাভাজন। তবে আপনি যে বলিলেন, 'আমরা উভয়েই একগুরুর শিষ্য', আমি ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আমি এই দশ বৎসর সর্ব্বক্ষণ আচার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আছি ; কিন্তু একদিনও আপনাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

একলব্য। বলিতেছি, শুনুন।

(সানুচর দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

উভয়ে। এই যে আচার্য্য উপস্থিত। (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)।

দ্রোণ। বেশ ত অর্জ্জুন! তুমি এখানে দাঁড়াইয়া আছ, আর আমরা তোমার জন্য সমস্ত বন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতেছি! বলি, কিছু জানিতে পারিলে কি? আমরা ত খুঁজিয়া পাইলাম না, কাহার শরে কুকুরটার মুখ বন্ধ হইয়াছিল।

অর্জ্জুন। (একলব্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) গুরুদেব, ইনিই সেই অসামান্য ধনুর্দ্ধর; আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইনি আপনারই শিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন! আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, শিষ্যদিগের মধ্যে আমাকেই সর্ব্বপ্রধান করিবেন। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা তো রক্ষা হয় নাই, গুরুদেব! ইনি যে আমাকে অতিক্রম করিয়াছেন!

দ্রোণ। কি বলিলে, অর্জ্জুন? এ যুবক আমার শিষ্য! কি হে যুবক? আমি তোমাকে কখন শিক্ষা দিয়াছি, বল ত!

একলব্য। আচার্য্য, সে আজ দশ বৎসরের কথা। লোকমুখে শুনিয়াছিলাম, আপনি হস্তিনাপুরের রাজকুমারদিগের শিক্ষা বিধানে ব্রতী হইয়াছেন। ইহাতে আমারও একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল যে, আপনার পদতলে বসিয়া অস্ত্রপ্রয়োগ শিক্ষা করি। আমি হস্তিনাপুরে গিয়া আপনার নিকট প্রার্থনা জানাইলাম। আমি নিষাদপুত্র হইয়া ক্ষত্রিয়কুমারদিগের সহাধ্যায়ী হইব এবং অস্ত্রবিদ্যায় তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিব, ইহা আপনি সঙ্গত মনে করিলেন না। কাজেই আমি হতাশ হইয়া ফিরিলাম; কিন্তু শিক্ষার সঙ্কল্প ভুলিলাম না।

বেদির উপর ঐ যে প্রতিমা দেখিতেছেন, উঁহা আপনারই মূর্ত্তি। আমি বনে আসিয়া ঐ মূর্ত্তি গড়িলাম এবং উহাকেই গুরুপদে বরণ করিয়া অস্ত্র-প্রয়োগ অভ্যাস করিতে লাগিলাম। হস্তিনাপুরে যে কয় দিন ছিলাম, দূরে দূরে থাকিয়া আপনার অস্ত্রপ্রয়োগ কৌশল দেখিয়াছিলাম; আপনি রাজপুত্রদিগকে যে উপদেশ দিতেন, তাহাও শুনিয়াছিলাম। সেই সমস্ত আমার হৃদয়ে গাঁথা ছিল। এই সম্বল লইয়া এবং আপনার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আমি গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলাম। এখন যদি সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকি, তাহা আপনারই প্রসাদে। অতএব বিচার করিয়া দেখুন, আমি আপনাকে আচার্য্য বলিয়া পূজা করিতে পারি কি না।

দ্রোণ। নিষাদকুমার! আমি তোমার প্রতিভা ও অধ্যবসায় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। কিন্তু তুমি যখন আমাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, তখন কেবল শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তোমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে, ইহা মনে করিও না। শিক্ষান্তে গুরু-দক্ষিণা দিতে হয়। আমাকে দক্ষিণা দিয়া তুষ্ট কর।

একলব্য। আজ্ঞা করুন, কি দিয়া এ দাস আপনাকে তুষ্ট করিতে পারে। আপনি যাহা চাহিবেন, সাধ্য থাকিলে তাহাই সংগ্রহ করিয়া শ্রীচরণে অর্পণ করিব।

দ্রোণ। চাই তোমার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠটী।

একলব্য। যে আজ্ঞা, গুরুদেব! (কটিদেশ হইতে তরবারি বাহির করিয়া অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদন ও সহাস্যবদনে দ্রোণের পদতলে অর্পণ) আজ আমি কৃতার্থ হইলাম। যে বিদ্যা শিখিয়াছি,

তাহা আর প্রয়োগ করিতে পারিব না বটে, কিন্তু আমার শিক্ষা যে ফলবতী হইয়াছে, ইহাতেই আমার অপার আনন্দ; আর যিনি ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, আমার মনে ইহার বীজ বপন করিয়াছেন, আজ যে তাঁহাকে দক্ষিণা দিয়া তুষ্ট করিতে পারিলাম, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য।

দ্রোণ। নিষাদকুমার! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরসুখী হও! অর্জ্জুনের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহার পালনের জন্য আমাকে আজ এই নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে হইল। কিন্তু তুমি যে আমার শিষ্যস্থানীয়, ইহা আমি চিরদিন সগৌরবে স্মরণ রাখিব। তুমি নিজে বিকলাঙ্গ হইয়াও যে গুরুর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে, তোমার এ কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে না।

[সশিষ্য দ্রোণাচার্য্যের প্রস্থান।]

প্রতিজ্ঞা পালন।*

কুরুক্ষেত্রে মহাসমর হইতেছে; রক্তের গঙ্গা ছুটিয়াছে, সহস্র সহস্র যোদ্ধা, হস্তী ও অশ্ব প্রতিদিন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে।

এখন যেমন অবিরত যুদ্ধ চলে, দুই দলেই দিনরাত মারামারি কাটাকাটি করে, যুদ্ধের পরেও শক্রতার বিরাম হয় না, কুরুক্ষেত্রে সেরূপ ঘটে নাই। সেখানে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই উভয় পক্ষের সেনানীরা কতকগুলি উৎকৃষ্ট নিয়ম নির্দ্ধারণ

* এই আখ্যায়িকাটী সংস্কৃত মহাভারতে নাই, কিন্তু কাশীরামের গ্রন্থে আছে।

করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়া দিয়াছিলেন, দিনমানে যুদ্ধ চলিবে বটে, কিন্তু সূর্য্যাস্ত হইলে সকলকেই অস্ত্রত্যাগ করিয়া বিশ্রাম করিতে হইবে; যখন যুদ্ধ নিবৃত্ত হইবে, তখন দুই পক্ষেই পুনর্ব্বার পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবে মিশিবে, যুদ্ধকালেও কেহ কাহাকে সতর্ক না করিয়া প্রহার করিতে পারিবে না। দেখ দেখি, কি সুন্দর ব্যবস্থা! এই ব্যবস্থার গুণেই যাঁহারা দিনমানে পরস্পরের কণ্ঠচ্ছেদনে প্রয়াসী, তাঁহাদেরই কেহ কেহ রাত্রিকালে বিপক্ষের শিবিরে গিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন বা সুখদুঃখের কথা বলিতেন।

তখন লোকের আর একটী প্রধান ধর্ম্ম ছিল প্রতিজ্ঞাপালন। কেহ কোন অঙ্গীকার করিলে শত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহা রক্ষা করিতেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, যিনি কুরুক্ষেত্রের এই বিষম অনর্থের মূল, সেই দুর্য্যোধনের চরিত্রেও এই সদ্-গুণের অভাব ছিল না।

দুর্য্যোধন আশা করিয়াছিলেন, ভীষ্মের শরাঘাতে দুই এক দিনের মধ্যেই পঞ্চপাণ্ডবের প্রাণনাশ হইবে। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, সাত দিনের যুদ্ধের পরও পাণ্ডবেরা কেহই মারা গেলেন না, তখন তিনি বড় হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি সন্ধ্যার পর ভীষ্মের শিবিরে গিয়া নিজের দুঃখ জানাইলেন, এবং ভীষ্ম যেন পাণ্ডবদিগের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইতেছেন, প্রকারান্তরে এ কথাও বলিতে ছাড়িলেন না। ইহাতে ভীষ্মের মনে বড় আঘাত লাগিল; তিনি তূণীর হইতে পাঁচটী শর বাছিয়া লইয়া বলিলেন, "তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি এই পাঁচ বাণে কাল পঞ্চপাণ্ডবের

প্রাণান্ত করিব।” দুর্য্যোধন জানিতেন, ভীষ্ম যাহা বলেন, তাহার ব্যতিক্রম হয় না। অতএব পাণ্ডবদিগের যে সর্ব্বনাশ হইবে, ইহাতে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। তিনি মহানন্দে নিজের শিবিরে ফিরিয়া গেলেন।

ভীষ্মের এই প্রতিজ্ঞার কথা অচিরে পাণ্ডবদিগের কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অনাথের নাথ শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই আত্মীয়। তিনি যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, “আমি দুই দলেরই সহায়তা করিব—একদলের সহায় হইবে আমার সেনা, এক দলের সহায় হইব আমি নিজে। কিন্তু যেখানেই থাকি না কেন, আমি এই যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব না।” এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন ভাবিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ একা, তাঁহার সেনা বহুসংখ্যক ; বিশেষতঃ তিনি নিজে অস্ত্রধারণ করিবেন না। অতএব আমি তাঁহার সেনাই লইব। তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, যুধিষ্ঠির মহাসন্তোষের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন ; কারণ তিনি জানিতেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেইখানেই জয়লক্ষ্মী। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়া অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, “তোমার মনে আছে যে, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন দুর্য্যোধনকে বন্দী করিলে, তিনি তোমারই বাহুবলে মুক্তি পাইয়াছিলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া দুর্য্যোধন তোমাকে একটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু তুমি ‘পরে লইব’ বলিয়া তখন কোন বর গ্রহণ কর নাই। চল, আমরা দুর্য্যোধনের

শিবিরে যাই। আমি বাহিরে অপেক্ষা করিব; তুমি গিয়া তাঁহার মুকুটটী চাহিয়া লইবে এবং ঐ মুকুট পরিয়া তাঁহারই বেশে ভীষ্মের বাণ পাঁচটী আত্মসাৎ করিবে।”

অর্জ্জুন কুরুরাজের শিবিরে গেলেন; তাঁহার আগমনের কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন তাঁহাকে অতি সমাদরে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাই, কি মনে করিয়া আসিয়াছ, বল তো?” অর্জ্জুন কহিলেন, “দাদা, আমাকে একটী বর দিবেন, কথা ছিল। আজ সেই বর চাহিতে আসিলাম। আপনার মুকুটটী আমায় দান করুন।” দুর্য্যোধন বুঝিতে পারিলেন, অর্জ্জুনের কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে, হয় তো ইহা লাভ করিয়া পাণ্ডবেরা কৌরবদিগের কোন অহিতও করিতে পারেন। তথাপি তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন—মুকুটটী আনিয়া সযত্নে অর্জ্জুনের মস্তকে পরাইয়া দিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের বেশ ধরিয়া ভীষ্মের শিবিরে গেলেন। ভীষ্ম তখন অর্দ্ধনিদ্রিতভাবে ছিলেন; তিনি শিবিরের অস্পষ্ট আলোকে অর্জ্জুনকে চিনিতে পারিলেন না, ভাবিলেন, দুর্য্যোধনই আবার আসিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “এত রাত্রিতে আবার কেন?” অর্জ্জুন বলিলেন, “আপনি যে পাঁচটী বাণ বাছিয়া রাখিয়াছেন, দয়া করিয়া সেগুলি আমাকে দিন কারণ আমার একান্ত ইচ্ছা যে, স্বহস্তে পাণ্ডবদিগের মুণ্ড ছেদন করি।” ভীষ্ম তাঁহাকে বাণ পাঁচটী দিলেন; কিন্তু শিবিরদ্বারে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র নিজের ভ্রম বুঝিতে

পারিলেন। ইহার পর আরও কয়েকদিন যুদ্ধ চলিল বটে, কিন্তু কৌরবদিগের বলক্ষয় হইতে লাগিল এবং শেষে দুর্য্যোধন পরাজিত ও নিহত হইলেন। যদি তিনি প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য সে দিন অর্জ্জুনকে নিজের মুকুটটী না দিতেন, তবে পাণ্ডবদিগের ভাগ্যে কি হইত, তাহা কে বলিতে পারে?

ধর্ম্মব্যাধ।

কৌশিক-নামক এক ব্রাহ্মণকুমার নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া তপস্যা করিবার জন্য বনে গেলেন। গৃহে তাঁহার বৃদ্ধ মাতাপিতা ছিলেন; কৌশিক যাইবার কালে তাঁহাদের অনুমতি লইলেন না, কে যে তাঁহাদের সেবা করিবে, সে কথাও ভাবিলেন না।

কৌশিকের আর একটা মুখ্য দোষ ছিল। অতি সামান্য কারণেই তাঁহার ক্রোধ হইত, এবং ক্রোধের বশে তিনি একটা না একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিতেন। একদা তিনি একটা বৃক্ষের মূলে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে একটা বলাকা তাঁহার গাত্রে মলত্যাগ করিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সেই বলাকার দিকে এমন নিষ্ঠুর দৃষ্টিপাত করিলেন যে, তাহাতেই তাহার প্রাণনাশ হইল।

ইহাতে কৌশিকের মনে অনুতাপ জন্মিল; তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া ভিক্ষার জন্য এক গৃহস্থের ভবনে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্থপত্নী তাঁহাকে বসিবার আসন দিয়া ভিক্ষা আনিতে গেলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে গৃহস্থ ক্ষুধাতুর হইয়া গৃহে ফিরিলেন। তখন ঐ রমণী কৌশিককে ভিক্ষা না দিয়া স্বামীর পরিচর্য্যা আরম্ভ

করিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ অতীত হইলে, কৌশিকের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি লজ্জিত হইয়া ভিক্ষা দিবার জন্য বাহিরে আসিলেন।

বিলম্বহেতু কৌশিকের মনে আবার ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল। রমণী তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন; আমি স্বামীকে পরমদেবতা বলিয়া জ্ঞান করি। তিনি ক্ষুধাতুর ও পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, এজন্য অগ্রে তাঁহার সেবা করিতেছিলাম।" এ কথায় কিন্তু কৌশিকের ক্রোধ দূর হইল না। তিনি বলিলেন, "কি আস্পর্দ্ধা! তুমি ব্রাহ্মণকে গুরু বলিয়া মান না, স্বামীকে গুরুতর মনে কর! তুমি কি জান না, আমি শাপ দিয়া এখনই তোমার সর্ব্বনাশ করিতে পারি?" রমণী উত্তর দিলেন, "আপনার পায়ে পড়ি, ক্রোধ সংবরণ করুন। আমি যদি অন্যায় না করিয়া থাকি, তবে আপনার শাপে আমার কি হইতে পারে? আপনি কি আমাকে সেই বলাকা মনে করিয়াছেন যে, ক্রোধবলে আমাকে ভস্ম করিবেন? আপনি বিদ্বান্ ও তপস্বী, কিন্তু বোধ হইতেছে, আপনি যথার্থ ধর্ম্ম জানেন না। আপনি একবার মিথিলায় যান; সেখানে এক পরমধার্ম্মিক ব্যাধ আছেন। লোকে তাঁহাকে ধর্ম্মব্যাধ বলে। তাঁহার মুখে ধর্ম্মকথা শুনিলে আপনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিবেন।"

রমণী বলাকা-বধ-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছেন বুঝিয়া কৌশিকের বড় বিস্ময় জন্মিল। তিনি নিজের অন্যায়াচরণ স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার অনুতপ্ত হইলেন। অনন্তর, ধর্ম্মব্যাধের

দর্শন পাইবার জন্য তিনি নানা নগর ও গ্রাম অতিক্রম করিয়া মিথিলায় উপস্থিত হইলেন।

ধর্ম্মব্যাধ তখন মাংস বিক্রয় করিতেছিলেন। বহুলোকে মাংস ক্রয় করিতে আসিয়াছে দেখিয়া কৌশিক একান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু ব্যাধ তাঁহাকে দেখিবামাত্র আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, "বিপ্রবর, আমি আপনাকে প্রণাম করি। সেই পতিব্রতা রমণী আপনাকে এখানে আসিতে বলিয়াছেন। আপনি যে নিমিত্ত আসিয়াছেন, আমি তাহা অবগত আছি।"

ব্যাধ তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় জানিয়াছেন বুঝিয়া কৌশিক বড় বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "বাপু, তোমার তো অদ্ভুত ক্ষমতা! তুমি দেখিতেছি মানুষের মনের কথা জানিতে পার! কিন্তু তুমি যে মাংস বিক্রয় কর, ইহা তো আমার ভাল লাগে না। মাংস-বিক্রয় অতি নিষ্ঠুর কাজ নয় কি?"

ব্যাধ বলিলেন. "এ আমার কুলগত ব্যবসায়। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা এই বৃত্তি দ্বারাই সংসার চালাইয়াছেন। কাজেই আমি ইহাতে কোন দোষ দেখি না। আমি মাংস বিক্রয় করি বটে, কিন্তু প্রাণিহত্যা করি না; যাহারা পশু পক্ষী মারে, তাহাদের নিকট হইতে মাংস কিনিয়া বেচি। আমি কখনও ক্রোধের বশ হইয়া অন্যায়াচরণ করি না; অগ্রে দেবতা, অতিথি ও ভিক্ষুকদিগকে না দিয়া খাই না; পরের নিন্দা, কুৎসা করি না; কাহারও ভাল দেখিলে ঈর্ষ্যা করি না। আমি গুরুজনের সেবা করি, শত্রুকেও তুষ্ট করিতে চেষ্টা করি। এখন আপনিই বিচার করুন, আমি তিরস্কারের পাত্র কি না"

ইহার পর কৌশিক ব্যাধের মুখে বহু ধর্ম্মকথা শুনিলেন। মাংস বিক্রয় করিলেও তিনি যে পরম ধার্ম্মিক, সে বিষয়ে কৌশিকের মনে কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুমি সিদ্ধপুরুষ; ধর্ম্মবিষয়ে তোমার কিছুই অবিদিত নাই।" ব্যাধ বলিলেন, "আমি যে ধর্ম্মের বলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, তাহা দেখাইতেছি। চলুন, একবার বাড়ীর ভিতরে যাই।"

কৌশিক ব্যাধের সহিত ভিতরে গেলেন। সেখানে ব্যাধের মাতা ও পিতা শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া উৎকৃষ্ট আহারে পরিতুষ্ট হইয়া বিচিত্র আসনে বসিয়া ছিলেন। ব্যাধ তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন; তাঁহারাও আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বৎস, দীর্ঘজীবী হও, তুমি আমাদের সৎপুত্র; তোমার সেবায় আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছি।" তখন ব্যাধ কৌশিককে বলিলেন, "ইঁহারাই আমার দেবতা। লোকে ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করে, আমি ইঁহাদের পূজা করি—যথাসাধ্য ভোজ্য, পানীয়, গন্ধ ও মাল্য দ্বারা ইঁহাদের তৃপ্তি জন্মাই। আমি স্বয়ং ইঁহাদিগকে স্নান করাই; স্বহস্তে ইঁহাদিগকে আহার দিই। কদাপি ইঁহাদের অপ্রিয় কোন কথা বলি না। বিপ্রবর, আপনি কিন্তু মোহবশে এরূপ প্রত্যক্ষ দেবতা দুইটীর সেবা করেন নাই, তাঁহাদের অগোচরে গৃহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বৃদ্ধ ও অন্ধ; তাঁহাদের যে কত কষ্ট হইবে, আপনি এ কথা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। বলুন তো, ইহাতে কি আপনি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন?"

কৌশিক বলিলেন, "মহাশয়, আপনি যাহা বলিলেন, সমস্তই

সত্য। আমি এতদিনে দিব্যচক্ষু পাইলাম; আপনার কৃপায় আমার মোহ দূর হইল। আমি গৃহে ফিরিয়া চলিলাম; দেখি, কায়মনোবাক্যে জনক-জননীর তৃপ্তি সাধন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি কি না।”

বীরবরের প্রভুভক্তি

(১)

উজ্জয়িনী হইতে ঝান্সী যাইবার পথে বেত্রবতী নদীর তীরে বিদিশা (বা ভিল্‌সা) নগরী। ইহার অনতিদূরে সাঞ্চী-নামক স্থানে, দুই হাজার বৎসরেরও অধিক হইল, বৌদ্ধেরা যে সকল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও এদেশের লোকের অসামান্য অতীত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে।

এই বিদিশায় একদা শূদ্রক-নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। তিনি যেমন প্রতাপশালী, তেমনই বিদ্বান্ এবং তেমনই ধার্ম্মিক ছিলেন। একদিন তিনি সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী নিবেদন করিল, “মহারাজ, বীরবর-নামক এক রাজপুত্র আপনার দর্শনলাভের আশায় দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন।” রাজা প্রতিহারীকে বলিলেন, “তাঁহাকে এখনই এখানে লইয়া আইস।”

প্রতিহারী বীরবরকে রাজার সম্মুখে লইয়া গেল। বীরবরের দেহ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ, মুখে বীরত্বের ও সাধুতার চিহ্ন যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র শূদ্রকের মনে শ্রদ্ধা জন্মিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, তুমি কে এবং কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছ ?" বীরবর উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি এক রাজার পুত্র ; পৈতৃক সিংহাসন আমার অগ্রজের প্রাপ্য ; এজন্য, আমি নিজে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ করিব, এই সঙ্কল্প করিয়া আমি তাহাদিগকে লইয়া এখানে আসিয়াছি ; যদি মহারাজের সংসারে কোন কাজ পাই, তবে আমার জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় হয় ।"

"তুমি কি কাজ করিবে, আর বেতনই বা কি চাও ?"

"মহারাজ, আমি ক্ষত্রিয় ; আমাকে ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত যে কোন কাজ দিবেন, প্রাণপণে তাহাই সম্পাদন করিব। আমি প্রতিদিন চারি শত সুবর্ণ * বেতন পাইব, এইরূপ আশা করি ।"

"বল কি ? প্রতিদিন চারি শত সুবর্ণ ! এত অধিক বেতন তো আমি দিতে পারিব না ।"

"মহারাজ কর্ত্তা ; যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন। আমার প্রার্থিত বেতন যদি অসঙ্গত মনে করেন, তবে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমায় বিদায় দিন ।" ইহা বলিয়া বীরবর শূদ্রককে প্রণাম করিয়া সভা হইতে চলিয়া গেলেন।

তখন প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ, অন্ততঃ চারিদিনের বেতন দিয়া এই লোকটীর ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেখুন ; আমার মনে হইতেছে, ইহার এমন কোন অসামান্য গুণ আছে, যাহার তুলনায় দৈনিক চারি শত সুবর্ণও তুচ্ছ ।"

---

* প্রাচীনকালের একপ্রকার স্বর্ণমুদ্রা। ইহার ওজন ছিল ৮০ রত্তি অর্থাৎ প্রায় ৸৫ আনা।

মন্ত্রীর কথায় শূদ্রক বীরবরকে ফিরাইয়া আনাইলেন এবং তাঁহাকে একটা তাম্বূল ও বেতন দিয়া চারিদিনের জন্য নিযুক্ত করিলেন।

বীরবর আবাসে গিয়া প্রাপ্ত বেতনের অর্দ্ধাংশ দেবসেবায় ও ব্রাহ্মণসেবায় ব্যয় করিলেন, চতুর্থাংশ দীন-দরিদ্রদিগকে দিলেন এবং অবশিষ্ট নিজের ভোগের জন্য রাখিলেন। গোপনে অনুসন্ধান করিয়া শূদ্রক যখন ইহা জানিতে পারিলেন, তখন বীরবরের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পাইল।

(২)

বীরবর অহোরাত্র খড়গহস্তে রাজদ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার আদেশ না পাইলে তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যত্র যাইতেন না। এইরূপে দুই দিন অতিবাহিত হইলে, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর নিশীথসময়ে রাজা প্রাসাদের বাহিরে করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্বারে কে আছে ?" বীরবর উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা, আমি বীরবর।"

"ক্রন্দনের অনুসরণ করিয়া দেখ ত, ব্যাপার কি।"

"যে আজ্ঞা, মহারাজ !"

ইহা বলিয়া বীরবর চলিয়া গেলেন। তখন রাজা ভাবিলেন, 'কাজটা ভাল হইল না ; লোকটাকে এই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে একাকী বাহিরে যাইতে বলা অনুচিত হইয়াছে। অতএব আমিও গিয়া দূরে দূরে ইহার অনুসরণ করিতে থাকি। কি জানি, যদি কোন বিপদ্ ঘটে, তবে ইহার সাহায্য করিতে পারিব।'

এই সঙ্কল্প করিয়া রাজাও খড়গহস্তে যাত্রা করিলেন এবং

ক্রমে নগরদ্বারের বাহিরে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেখানে গিয়া দেখিলেন, বীরবর এক পরমসুন্দরী রমণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন এবং ঐ রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, "আমি শূদ্রকের রাজলক্ষ্মী; তাঁহার গুণে এতদিন পরমসুখে ছিলাম; কিন্তু আর দুই দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইবে; তখন আমি কোথায় যাইব, ইহা ভাবিয়া আকুল হইয়াছি।" বীরবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজার প্রাণ রক্ষা হয় এবং আপনিও এখানে থাকিতে পারেন, এমন কি কোন উপায় নাই?"

"একটা উপায় যে না আছে, এমন নয়; কিন্তু তাহা একরূপ অসম্ভব। তোমার শক্তিধর-নামক একটী সর্ব্ব-সুলক্ষণযুক্ত পুত্র আছে। যদি তুমি স্বহস্তে তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলাকে দিতে পার, তবে শূদ্রকের শতবর্ষ পরমায়ুঃ হইবে; আমিও অনাথা হইব না।"

রাজলক্ষ্মী ইহা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন, বীরবরও আবাসে ফিরিয়া গেলেন এবং নিজের পত্নী ও পুত্রকে জাগাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। তাঁহারা উভয়েই বলিলেন, "প্রভুর হিতসাধনের এমন সুযোগ ছাড়া যায় না। আজই হউক, শতবর্ষ পরেই হউক, মানুষকে যখন মরিতেই হইবে, তখন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রাণত্যাগ করা তো সৌভাগ্যের বিষয়।"

এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা তিনজনে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে গেলেন এবং সেখানে দেবীর পূজা শেষ হইলে, "মা, মহারাজ শূদ্রকের জয় হউক; আপনি এই উপহার গ্রহণ করুন" বলিয়া বীরবর শক্তিধরের মুণ্ড ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন,

"রাজার নিকট যে বেতন গ্রহণ করিয়াছি, তাহার প্রতিদান করিলাম। এখন পুত্রহীন অবস্থায় জীবনভার বহন করা বিড়ম্বনা মাত্র।" ইহা বলিয়া তিনি নিজেরও শিরশ্ছেদ করিলেন এবং তাঁহার পতিপুত্রশোকাতুরা পত্নীও ঐরূপে তাঁহার অনুগমন করিলেন।

শূদ্রক দূরে থাকিয়া সমস্ত কাণ্ড দেখিতেছিলেন। যখন এই তিন জন মহাপ্রাণীরই নির্মস্তক দেহ ভূমিতে পতিত হইল, তখন তিনি বিস্ময়াভিভূত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "হায়, আমার মত লক্ষ লক্ষ জীব প্রতিদিন জন্মিতেছে ও মরিতেছে; কিন্তু এই যে তিন ব্যক্তি আমারই জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিল, ইহাদের মত কেহ তো এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে জন্মে নাই এবং জন্মিবেও না? ধিক্ আমার রাজ্যে, ধিক্ আমার জীবনে? আমারই জন্য যে ইহারা প্রাণত্যাগ করিল, এ দুঃখ তো আমার পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষাও ভীষণ। অতএব আমিও ইহাদের অনুগামী হইব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি যেমন নিজের শিরশ্ছেদের জন্য খড়্গ তুলিলেন, অমনই ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলা প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস নিবৃত্ত হও, তুমি প্রাণত্যাগ করিলে রাজলক্ষ্মী অনাথা হইবেন।" রাজা তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "আমার রাজ্যে কি লাভ, মা? জীবনেই বা কি সুখ? যদি আপনার দয়া হইয়া থাকে, তবে আমার যে আয়ুঃ আছে, তাহা দিয়া এই তিন জনকে পুনর্জীবিত করুন, নচেৎ ইহারা যে পথে গিয়াছে, আমিও সেই পথে যাইব।"

তখন সর্ব্বমঙ্গলা বলিলেন, "তোমার সাধুতায় ও ভৃত্যবাৎসল্যে

ব্রাহ্মণকুমারের নাম কি, নিবাস কোথায়, কি জন্যই বা তিনি হঠাৎ তাঁহার এত হিতৈষী হইলেন, রাজা এ সকল জানিবার প্রয়োজন দেখিলেন না ; কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কবে যাত্রা করিতে চান ?" ব্রাহ্মণকুমার বলিলেন, "শুভস্য শীঘ্রং ; চলুন, আগামী কল্যই যাত্রা করা যাউক। আপনি সৈন্য সুসজ্জিত করুন। আমি কল্যই আপনার সঙ্গে যোগ দিব।" হর্ষাতিশয়ে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন না যে, ব্রাহ্মণকুমার কোথায় অবস্থিতি করিবেন, বা তাঁহার আহারাদির কি ব্যবস্থা হইবে।

ব্রাহ্মণকুমার চলিয়া গেলে সৈন্য সুসজ্জিত করিবার ধূম পড়িয়া গেল। শত শত হস্তী, অশ্ব ও রথ এবং সহস্র সহস্র পদাতি সমবেত হইয়া রাজধানী তোলপাড় করিয়া তুলিল। কিন্তু পরদিন আর সেই ব্রাহ্মণকুমারের দেখা নাই ! যখন সূর্য্য অস্ত যায় যায়, তখন রাজা নিতান্ত হতাশ হইয়া অমাত্যদিগকে বলিলেন, "দেখুন, কাল যে ব্রাহ্মণকুমার আসিয়াছিলেন, তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, পঞ্চাল, কেকয় ও কুরু, এই তিনটী রাজ্য জয় করিয়া দিবেন। সেই জন্য এই যুদ্ধায়োজন। আজিই তাঁহার আসিবার কথা ; কিন্তু এখনও যখন তিনি আসিলেন না, তখন তাঁহাকে আনিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।"

অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায় থাকেন, মহারাজ ?" "তা' জানি না।" "তবে কোথায় খুঁজিব ? আপনি কি তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই ?" "না।" "তাঁহার নাম কি ?" "তা'ও জানি না। তোমরা নগরের পথে পথে অনুসন্ধান কর।"

(২)

অমাত্যেরা বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি সেই ব্রাহ্মণ-কুমারকে দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে রাজার বড় মনস্তাপ হইল। তিনি ভাবিলেন, হায়, আমি নিজের মূঢ়তায় এমন ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইলাম! দুঃখে তাঁহার বুক শুকাইয়া গেল, রক্ত কুপিত হইল; তিনি রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইলেন। বৈদ্যেরা যথাসাধ্য চিকিৎসা করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন সুফল পাওয়া গেল না।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে ইন্দ্র আবার অন্য একটা ব্রাহ্মণ-কুমারের বেশ ধরিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি আপনার চিকিৎসা করিতে আসিয়াছি।" রাজা বলিলেন, "কত বড় বড় প্রবীণ রাজবৈদ্য হা'র মানিলেন; এখন কি না একটা বালক আমায় নীরোগ করিবে! যাও, উহাকে কিছু পাথেয় দিয়া বিদায় কর।" কিন্তু ইন্দ্র উত্তর দিলেন, "চিকিৎসার জন্য বৈদ্যের বয়স্ কত, ইহা জানিবার প্রয়োজন কি? তোমরা রাজাকে গিয়া বল, আমি পারিশ্রমিক চাই না।"

অতঃপর রাজভৃত্যেরা ছদ্মবেশী ইন্দ্রকে রাজার নিকটে লইয়া গেল। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পীড়ার কারণ বলুন; কি কারণে, কি খাইয়া বা পান করিয়া, কি শুনিয়া বা দেখিয়া ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা জানিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছি।"

রাজা বলিলেন, "বাপু, তোমারই মত এক ব্রাহ্মণকুমার এক দিন আসিয়া আমায় বলিযাছিলেন যে, তিনটী রাজ্য জয় করিয়া

আমাকে দান করিবেন। আমি সেইজন্য সৈন্যসামন্ত সজ্জিত করিয়া রাখিলাম ; কিন্তু তিনি আসিলেন না। বিদায় দিবার সময়ে তাঁহার বাসস্থান ও আহারের কোন ব্যবস্থা করি নাই বলিয়াই বোধ হয়, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। বুদ্ধির দোষে বিপুল ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইলাম, ইহা ভাবিতে ভাবিতে আমি পীড়িত হইয়াছি।”

ইন্দ্র বলিলেন, “আপনার চিকিৎসা করিতে হইবে জ্ঞানরূপ ঔষধ দ্বারা ; গাছ-গাছড়ায় এ রোগের উপশম হইবে না। আচ্ছা, ঐ রাজ্য তিনটী তো আপনার নয় ; তবে, বলুন তো, আপনি কেন ভাবিতেছেন যে, ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইলাম ? আবার ভাবুন, ঐ রাজ্য তিনটী অধিকার করিতে পারিলেই বা আপনার কি লাভ হইত ? আপনি কি একসঙ্গে চারিখানি সোণার থালায় এখনকার চারি গুণ ভাত খাইতেন, বা একসঙ্গে চারিখানি ধুতি পরিতেন, বা একসঙ্গে চারিখানা খাটে শুইতেন ? জীবনধারণের জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা পাঁচ টাকায় কিনিলেও যে কথা, পাঁচ লক্ষ টাকায় কিনিলেও সেই কথা। আপনার যাহা আছে, তাহাতে যদি আপনার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হয়, তবে আরও পাইবার আশায় ছুটাছুটি করেন কেন, আর না পাইলেই বা দুঃখিত হন কেন ?”

রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া ইন্দ্র সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। রাজাও সান্ত্বনা লাভ করিলেন এবং ক্রমে সুস্থ হইয়া যথাধর্ম্ম প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।

অতিলোভের পরিণাম।

(১)

কোন গ্রামে চারিজন ব্রাহ্মণকুমারের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তাহারা সকলেই দরিদ্র; এ জন্য গৃহে আদর পাইত না, প্রতিবেশীরাও তাহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। ইহাতে তাহাদের মনে বড় আঘাত লাগিত। তাহারা একদিন বলাবলি করিতে লাগিল, "ভাই, দরিদ্রতার মত দুঃখ আর নাই। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে দরিদ্রভাবে থাকা অপেক্ষা ব্যাঘ্রসঙ্কুল বনে গিয়া বাস করাও ভাল। চল, আমরা বিদেশে গিয়া দেখি, অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি কি না।"

এই পরামর্শ করিয়া তাহারা গৃহ হইতে যাত্রা করিল এবং নানা স্থানে বিচরণ করিতে করিতে উজ্জয়িনী নগরে উপস্থিত হইল। উজ্জয়িনী অবন্তীরাজ্যের রাজধানী। এখানে সিপ্রা নদী উত্তরবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং সিপ্রাতীরে মহাকালের মন্দির বিরাজ করিতেছে।

ব্রাহ্মণকুমারেরা সিপ্রাজলে স্নান-তর্পণ করিয়া মহাকালের পূজা করিল। অনন্তর তাহারা মন্দির হইতে বাহির হইতেছে, এমন সময়ে ভৈরবানন্দ-নামক এক যোগীকে দেখিতে পাইল। তাহারা যোগীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ভৈরবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথা হইতে এবং কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ? যাইবেই বা কোথায়?"

ব্রাহ্মণকুমারেরা উত্তর দিল, "ভগবন্, আমরা অতি দরিদ্র; ধনলাভের জন্য বাহির হইয়াছি। যেখানে ধনপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, সেখানেই যাইব; তাহাতে মৃত্যু ঘটে, সেও শ্রেয়ঃ।

আপনি যোগী; যোগীরা অদ্ভুত শক্তিশালী। অনুগ্রহ করিয়া ধনলাভের একটা উপায় বলিয়া দিন।"

ব্রাহ্মণকুমারদিগের দুঃখের কথা শুনিয়া ভৈরবানন্দের দয়া হইল। তিনি মন্ত্র পাঠ করিয়া চারিটী বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিলেন এবং তাহাদিগকে সেইগুলি দিয়া বলিলেন, "এই চারিটী সিদ্ধিবর্ত্তিকা। তোমরা এক এক জনে এক একটা লইয়া হিমালয় পর্ব্বতে যাও। সেখানে যে স্থানে তোমাদের কাহারও হস্ত হইতে বর্ত্তিকা পতিত হইবে সেই স্থান খনন করিলে ধন পাইবে। যে ব্যক্তি ধন দেখিবে, সে যেন সঙ্গীদিগকে জানায়। তাহা করিলে অন্য সকলেও ইচ্ছামত ধন গ্রহণ করিতে পারিবে।"

(২)

ব্রাহ্মণকুমারেরা বর্ত্তিকা লইয়া হিমাচলে গমন করিল। সেখানে এক দিন এক জনের হাত হইতে বর্ত্তিকাটী পড়িয়া গেল। সে ঐ স্থান খনন করিয়া দেখিল, ভূগর্ভে প্রচুর তাম্র রহিয়াছে। তখন সে সঙ্গীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিল, "তোমরা যত ইচ্ছা, তাম্র গ্রহণ কর।" কিন্তু তাহারা বলিল, "তুমি অতি মূর্খ। তাম্র লইয়া কি লাভ? সমস্ত গৃহ তাম্রে পূর্ণ হইলেও কি দরিদ্রতা ঘুচিবে? চল, আমরা অন্যত্র যাই।" যে তাম্র পাইয়াছিল, সে বলিল, 'তোমরা অগ্রসর হইতে পার; আমি কিন্তু এখান হইতেই ফিরিব।" ইহা বলিয়া সে যত পারিল, তাম্র লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

অপর তিনজন ব্রাহ্মণকুমার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে

লাগিল; তাহাদের মধ্যে যে অগ্রগামী, কিয়দ্দিন পরে তাহার হস্ত হইতে বর্ত্তিকাটী ভূতলে পতিত হইল। সে খনন করিয়া দেখে, মৃত্তিকার মধ্যে প্রচুর রৌপ্য রহিয়াছে। ইহাতে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া সে সঙ্গীদিগকে বলিল, "আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই। এস, আমরা রৌপ্য লইয়া গৃহে প্রতিগমন করি।" তাহার সঙ্গীদ্বয় বলিল, "পশ্চাদ্‌ভাগে রহিয়াছে তাম্র, এখানে আছে রৌপ্য; অতএব ইহার পর নিশ্চয় স্বর্ণময়ী ভূমি পাওয়া যাইবে। দরিদ্রতার গ্রাস হইতে চিরদিনের মত অব্যাহতি পাইতে হইলে, স্বর্ণ সংগ্রহ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।" তাহারা দুই জন এই বলিয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু যে রৌপ্য পাইয়াছিল, সে যথাশক্তি রৌপ্য লইয়া নিবৃত্ত হইল।

ইহার কিছুদিন পরে তৃতীয় ব্রাহ্মণকুমারের হস্ত হইতে বর্ত্তিকাটী পতিত হইল। সে খনন করিয়া দেখে, প্রচুর সোণা রহিয়াছে। সে সঙ্গীকে বলিল, "এস, যত ইচ্ছা সোণা লও।" তাহার সঙ্গী বলিল, "দেখিলেই তো, প্রথমে পাওয়া গেল তামা, তাহার পর রূপা; তাহার পর সোণা; আরও অগ্রে যে মণি মাণিক্য পাওয়া যাইবে, ইহাতে কি আর সন্দেহ আছে? লোকে বলে, সাত রাজার ধন এক মাণিক। যদি মাণিকের মত মাণিক একটাও পাই, তবে বংশানুক্রমে দরিদ্রতার ভয় থাকিবে না।" কিন্তু যে স্বর্ণ পাইয়াছিল, সে বলিল, "তুমি যাও; আমার পক্ষে সোণাই যথেষ্ট।

ইহা শুনিয়া চতুর্থ ব্যক্তি একাকী অগ্রসর হইল। তখন গ্রীষ্মকাল; মধ্যাহ্নসূর্য্য প্রখর কর বর্ষণ করিতেছিল। সে

পথশ্রমে ও পিপাসায় আকুল হইয়া পথ হারাইল, এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল, এক ব্যক্তির মস্তকে একটা চক্র ঘূরিতেছে এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে প্লাবিত হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে হে তুমি, মাথায় একটা চাকা লইয়া বসিয়া আছ, আর চাকাটা কেবলই ঘূরিতেছে? আমার বড় পিপাসা পাইয়াছে; জল কোথায় পাই, বল।"

ব্রাহ্মণকুমার এই কথা কয়টী বলিবামাত্র চক্রটী সেই ব্যক্তির মস্তক ত্যাগ করিয়া তাহারই মস্তকে সংলগ্ন হইল। ইহাতে অতিমাত্র ভীত ও বিস্মিত হইয়া ব্রাহ্মণকুমার বলিল, "বেশ তো তোমার ভদ্রতা!" সে ব্যক্তি বলিল, "ভাই, আমার মস্তকেও চক্রটী এইরূপে সংলগ্ন হইয়াছিল।"

"উঃ! চাকাটা যে ভয়ানক যন্ত্রণা দিতেছে! কতদিন আমাকে এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে?"

"যে দিন আর কেহ তোমারই মত সিদ্ধিবর্ত্তিকা লইয়া তোমার সহিত আলাপ করিবে, সেই দিন তুমি মুক্তিলাভ করিবে।"

"তুমি কতকাল এটা বহন করিলে?"

"কতকাল বহন করিয়াছি, তাহা আমার গণিবার সাধ্য নাই। আমার এইমাত্র মনে আছে যে, যখন রামচন্দ্র অযোধ্যায় রাজা ছিলেন, তখন আমি ধনলোভে এই বিপদে পতিত হইয়াছিলাম।"

"এ ভাবে থাকিয়া তুমি খাদ্য ও পানীয় পাইতে কিরূপে?"

"সে জন্য কোন চিন্তা নাই। ধনাধিপতি কুবের এমনই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যাহারা এখানে ধনলোভে উপস্থিত হয়, তাহাদের ক্ষুধা, পিপাসা ও নিদ্রা থাকে না। তাহারা নিরন্তর বেদনাই ভোগ করে।"

যক্ষের ধন।

কোন নগরে এক নাপিত, রাজা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোক-দিগকে কামাইয়া যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতেই সুখে স্বচ্ছন্দে তাহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত।

একদিন সন্ধ্যার পর সে নগরের নিকটবর্ত্তী একটা বনের ভিতর দিয়া যাইবার কালে শুনিতে পাইল, কে যেন বলিতেছে, "তুমি কি সাত ঘড়া সোণা চাও?" নাপিত প্রথমে মনে করিল, যে, তাহার বোধ হয় শুনিতে ভ্রম হইয়াছে; কিন্তু আবার যখন ঐরূপ আকাশবাণী হইল, তখন তাহার লোভ জন্মিল। সে ভাবিল, 'হয় তো কোন বনদেবতা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অযাচিতভাবে এই অনুগ্রহ দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সাত ঘড়া সোণা পাইলে আমার বংশে কাহাকেও আর ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া বেড়াইতে হইবে না; সকলেই রাজার হালে কাল কাটাইতে পারিবে।'

ঐইরূপ চিন্তা করিয়া সে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল "আমি অতি দীনহীন। আপনি দয়া করিয়া আমার দুঃখ মোচন করুন।" তখন বৃক্ষশাখা হইতে কে যেন উত্তর দিল, "তুমি বাড়ী যাও; আমি সেখানে সাত ঘড়া সোণা রাখিয়া আসিয়াছি।"

নাপিত গৃহে গিয়া দেখিল, সেখানে সত্যসত্যই সাতটা

মুখঢাকা বড় বড় পিতলের কলসী রহিয়াছে। সে একে একে মুখ খুলিয়া দেখে, তাহাদের ছয়টাই মোহরে ভরা, আর একটাতেও মোহর আছে, কিন্তু উহা একটু খালি রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া নাপিত প্রথমে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল; কিন্তু একটু পরেই তাহার মনে হইল, একটা ঘড়া তো খালি রাখিলে চলিবে না; উহা যদি মোহর দিয়া পূরিতে না পারি, তবে ত আমার সাত ঘড়া সোণা হইল না।

তখন নাপিত খালি ঘড়া পূরিবার জন্য ব্যস্ত হইল। সে প্রথমে স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির যে দুই চারিখানি অলঙ্কার ছিল, সেগুলি বিক্রয় করিল এবং মোহর কিনিয়া ঐ কলসীটার ভিতরে ফেলিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইহাতে খালি জায়গা কমিল না। ইহার পর সে নিজের ও পরিজনবর্গের আহার কমাইল, কেবল একবেলা নুণভাত খাইতে লাগিল, তাহাও আধপেটা। সে রাজার নিকট কান্দাকাটি করিয়া বেতন বাড়াইয়া লইল; সারাদিন ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক উপার্জ্জন করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কলসীটা পূরিতে পারিল না।

অতিরিক্ত পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তায় ক্রমে নাপিতের শরীর ভগ্ন হইল। রাজা তাহাকে ভাল বাসিতেন। একদিন কামাইবার সময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি হইয়াছে বল তো? তোমার আর পূর্ব্বের মত হাসিখুসি ভাব নাই। তুমি পূর্ব্বে আমাকে তুষ্ট করিবার জন্য, জিজ্ঞাসা না করিলেও কত কথা বলিতে, কত লোকের নিন্দা ও প্রশংসা শুনাইতে। কিন্তু এখন তোমার মুখে কথাটী নাই, কি যেন একটা মহাভাবনায় পড়িয়াছ।

অথচ তোমার বেতন বাড়াইয়া দিয়াছি, পূজা পার্ব্বণেও তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুরস্কার দিতেছি। তুমি যক্ষের ধন পাইয়াছ না কি?"

যক্ষের ধনের নামে নাপিতের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। সে, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, রাজার নিকট নিবেদন করিল। রাজা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি এখনই গিয়া ঘড়া সাতটা ফিরাইয়া দাও। উহা যক্ষের ধন। যক্ষের ধন সঞ্চয়ের জন্য, ভোগের জন্য নহে। যাহারা উহা পায়, তাহারা চিরজীবন ধন উপার্জ্জন করিবার জন্য ছুটাছুটি করে; তাহারা আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায়, দয়াধর্ম্ম বিসর্জ্জন করে, নিজেরা কষ্ট পায, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিকেও কষ্ট দেয়।"

ধন পাওয়া অবধি নাপিতের মনে যে দুরাশার আগুন জ্বলিতেছিল, রাজার উপদেশে তাহা একেবারে নিবিয়া গেল। সে তখনই সেই বনে গিয়া বলিল, "রক্ষা কর; তোমার ধন তুমি লও।" তখন আকাশবাণী হইল, "তোমার মনের ভাব জানিবা-মাত্র আমি ঘড়াগুলি ফিরাইয়া আনিয়াছি : তাহাব জন্য অনুরোধ করিতে হইবে না।"

নাপিত গৃহে গিয়া দেখে, ঘড়াগুলি আর সেখানে নাই। অধিকন্তু এত কাল নানা কষ্টভোগ করিয়া নিজে যাহা অর্জ্জন করিযাছিল, তাহাও উড়িযা গিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও তাহার দুঃখ হইল না। সে মনে শান্তি পাইল, দেহে বল পাইল এবং অতিসঞ্চয়ের চেষ্টা ত্যাগ করিযা পূর্ব্বের মত সন্তুষ্টচিত্তে কাজকর্ম্ম করিতে লাগিল।

কৃশাগৌতমী।

শ্রাবস্তী নগরে কৃশাগৌতমী অল্প বয়সে একটী মাত্র পুত্র লইয়া বিধবা হইয়াছিল। কিছুদিন পরে এই পুত্রটীও হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া মারা গেল। এই শোকে কৃশাগৌতমী একেবারে উন্মত্ত হইল। সে পুত্রের মৃতদেহ লইয়া গৃহের বাহির হইল এবং যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই বলিতে লাগিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি; আমার বাছাকে বাঁচাইয়া দাও।"

তখন করুণাবতার বুদ্ধদেব জেতবন-বিহারে বাস করিতেন। কৃশাগৌতমীর উন্মাদভাব দেখিয়া কেহ কেহ ভাবিলেন, বুদ্ধ ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিবেন না। তাঁহারা কৃশাগৌতমীকে বলিলেন, "বাছা, তুমি জেতবনে গিয়া বুদ্ধদেবের শরণ লও। তাঁহার অপার জ্ঞান ও অসীম দয়া। তিনি ঔষধ দিলে তোমার পুত্র আবার জীবন লাভ করিবে।"

এই কথা শুনিয়া কৃশাগৌতমী জেতবনে ছুটিয়া গেল এবং বুদ্ধদেবের নিকট আপনার প্রার্থনা জানাইল। বুদ্ধদেব বলিলেন, "আমি একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছি; তুমি তাহা সংগ্রহ করিতে পারিবে তো?"

কৃশাগৌতমী উত্তর দিল, "নিশ্চয় পারিব। বলুন কি ঔষধ চাই; আমি এখনই তাহা আনিয়া দিতেছি।"

"এক মুষ্টি সরিষা।"

"ইহা তো যে সে বাড়ীতে পাওয়া যাইবে!"

"কিন্তু এমন বাড়ী হইতে আনিবে, যেখানে কেহ কখনও

মারা যায় নাই। যদি কোন বাড়ীতে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী, দাস, দাসী প্রভৃতি পরিজনের মধ্যে কখনও কাহারও মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে সেখানকার সরিষায় কোন ফল হইবে না।"

কৃশাগৌতমী মৃত পুত্রটীকে লইয়া সরিষা আনিবার জন্য নগরে গেল, এবং প্রথমেই যে বাড়ী দেখিতে পাইল, সেখানে এক মুষ্টি সরিষা ভিক্ষা চাহিল। কিন্তু গৃহস্থ যখন ভিক্ষা দিতে আসিলেন, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের বাড়ীতে কেহ তো কখনও মারা যায় নাই ?" গৃহস্থ উত্তর দিলেন, "বাছা, তুমি কি পাগল হইয়াছ ? জন্মিলেই যে মরিতে হয়, একথা কি ভুলিয়া গিয়াছ ?"

"তবে আপনার সরিষায় আমার কোন কাজ হইবে না," ইহা বলিয়া কৃশাগৌতমী আরও অনেক বাড়ীতে গেল, কিন্তু শুনিল, কোথাও বাড়ীর কর্ত্তা, কোথাও কর্ত্রী, কোথাও পুত্র, কোথাও কন্যা, এইরূপ কেহ না কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

পুনঃ পুনঃ এইরূপ শুনিয়া শেষে কৃশাগৌতমীর চৈতন্যোদয় হইল। সে দেখিল পৃথিবীতে এমন পরিবার নাই, যেখানে যম না প্রবেশ করিয়াছে, এমন প্রাণী নাই, যে অমর হইয়া আসিয়াছে। জন্মিলেই মরণ ঘটে, তবে দুই দশ দিন অগ্রে, আর পশ্চাতে। ইহার জন্য শোক করিলে কিছুমাত্র লাভ নাই, বরং নিজেকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া হয়।

এইরূপে প্রবোধ পাইয়া সে পুত্রের মৃতদেহটা নদীতে ফেলিয়া দিল। ইহার পর সে আর গৃহে ফিরিল না, ভিক্ষুণী হইয়া জেতবনেই বাস করিতে লাগিল এবং ধর্ম্মচিন্তায় ও ধর্ম্মকার্য্যে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিল।

অকালমৃত্যুর কারণ।

(১)

পুরাকালে কাশীরাজ্যের কোন গ্রামে এক অতি সাধুশীল ব্রাহ্মণপরিবারের বাস ছিল। এই বংশে পুরুষানুক্রমে কেহ কখনও কোন পাপকার্য্য করেন নাই; তাঁহারা সর্ব্বদা সত্যপথে চলিতেন, ভক্তিসহকারে দেবতা, সাধুপুরুষ ও অতিথিদিগের সেবা করিতেন, প্রাণপণে দানদুঃখীর কষ্ট মোচন করিতেন। তাঁহাদিগের মনে কখনও কুভাবের উদয় হইত না; তাঁহারা অন্যের সৌভাগ্য দেখিলে ঈর্ষ্যায় পুড়িতেন না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ইতর প্রাণী পর্য্যন্ত তাঁহাদের দয়া হইতে বঞ্চিত হইত না। তাঁহাদের দাসদাসী এবং প্রতিবেশীরাও সংসর্গ-মাহাত্ম্যে এই সকল উৎকৃষ্ট গুণ লাভ করিয়াছিল। এই নিমিত্ত লোকে ঐ ব্রাহ্মণ-পরিবারকে "ধর্ম্মপাল" আখ্যা দিয়াছিল এবং তাঁহাদের গ্রামখানিকে "ধর্ম্মপালপুর" বলিত।

যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন এই বংশে একটী সুশীল ও বুদ্ধিমান্ বালকের জন্ম হইয়াছিল। লোকে আদর করিয়া তাহাকে ধর্ম্মপালকুমার বলিত। ধর্ম্মপালকুমারের বয়স্ যখন ষোল বৎসর, তখন তাহার পিতা তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলা নগরে পাঠাইলেন। ধর্ম্মপালকুমার তক্ষশিলায় গিয়া একজন বিখ্যাত অধ্যাপকের শিষ্য হইল।

অনন্তর, হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া এই অধ্যাপকের জ্যেষ্ঠ পুত্রটী মারা গেল। তিনি পুত্রশোকে কাতর হইয়া

পড়িলেন ; তাঁহাকে প্রবোধ দেওয়া দূরে থাকুক, ধর্ম্মপালকুমার ব্যতীত অন্য সকল ছাত্রই তাঁহারই মত বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। একদিন তাহারা আক্ষেপ করিতেছিল, "হায়, আমাদের অধ্যাপক মহাশয়ের কি দুরদৃষ্ট! এমন উপযুক্ত পুত্র অকালে তাঁহার মায়া কাটাইয়া গেল!" ইহা শুনিয়া ধর্ম্মপালকুমার বলিল, "লোকে যে অকালে মারা যায় কেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। মানুষ মরণশীল বটে, কিন্তু তাহারা তরুণ বয়সে মরিবে কেন? আমি তো জানি, কেহই বৃদ্ধ না হইলে মরে না।"

ধর্ম্মপালকুমারের কথা শুনিয়া তাহার সমপাঠীরা বিস্মিত হইল। তাহারা বলিল, "তুমি যে, ভাই, আজ নূতন কথা শুনাইলে! মৃত্যুর কাছে কি বয়সের বিচার আছে? সদ্যঃপ্রসূত শিশু হইতে অশীতি বৎসরের স্থবির পর্য্যন্ত কেহই তো মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারে না।" ধর্ম্মপালকুমার উত্তর দিল, "বৃদ্ধ হইলে মরে বটে; কিন্তু তরুণ বয়সে মরিবে কেন? আমাদের বাড়ীতে কেহ যে অল্প বয়সে মরিয়াছে, ইহা দেখি নাই, শুনিও নাই।"

ছাত্রদিগের এই কথাবার্ত্তা শুনিয়া অধ্যাপক ধর্ম্মপালকুমারকে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, সত্যই কি তোমাদের বংশে কেহই তরুণ বয়সে মারা যায় নাই?" ধর্ম্মপালকুমার বলিল "হাঁ গুরুদেব, এ কথা সত্য।" এই উত্তরে অধ্যাপকের বড় কৌতূহল জন্মিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি ইহার পিতার নিকট গিয়া পরীক্ষা করিব, এ কথা কতদূর সত্য। যে পুণ্যের বলে এই পরিবার হইতে অকালমৃত্যু দূর হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলে আমিও সেইরূপ অনুষ্ঠান করিব।'

এই সঙ্কল্প করিয়া অধ্যাপক কয়েকখানি ছাগের অস্থি ধুইয়া একটা থলিতে পূরিলেন এবং কাশীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(২)

অধ্যাপক কাশীতে গিয়া ধর্ম্মপালকুমারের পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামীর এমনই শিক্ষার গুণ ছিল যে, তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভৃত্যেরা কোনরূপ পরিচয় না পাইয়াই "আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। তিনি বলিলেন, "তোমাদের প্রভুকে সংবাদ দাও যে, তক্ষশিলা হইতে ধর্ম্মপালকুমারের অধ্যাপক আসিয়াছেন।"

অধ্যাপকের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মপালকুমারের পিতা সসম্ভ্রমে বাহিরে আসিলেন, "আজ আমার সুপ্রভাত" বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন এবং মহাসমাদরে তাঁহাকে গৃহের ভিতর লইয়া গিয়া পাদ্য ও অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিলেন। অনন্তর, আহারান্তে যখন অধ্যাপক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, তখন ধর্ম্মপালকুমারের পিতা পুত্রের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অধ্যাপক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আপনার পুত্রটী বেশ বুদ্ধিমান্ ছিল, এবং অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিল। কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সে হঠাৎ রোগগ্রস্ত হইয়া মারা গিয়াছে। আপনি বিজ্ঞ লোক। জগতে কিছুই নিত্য নয়, ইহা মনে করিয়া তাহার জন্য শোক করিবেন না।"

অধ্যাপকের কথা শুনিয়া ধর্ম্মপালকুমারের পিতা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন দুঃসংবাদ শুনিয়াও আপনি হাসিতেছেন, ইহার কারণ কি?" ধর্ম্মপালকুমারের পিতা বলিলেন, "আমার পুত্র মরে নাই। হয় তো অন্য কেহ মরিয়াছে; আপনি ভ্রমক্রমে তাহাকেই আমার পুত্র বলিয়া মনে করিয়াছেন।"

"আপনার পুত্রই মরিয়াছে। এই দেখুন তাহার অস্থি। তাহার অস্থি দেখিলেও আপনি যদি একটু শান্তি পান, এই জন্য আমি এগুলি এত যত্ন করিয়া সঙ্গে আনিয়াছি।"

"এ অস্থি হয় ছাগলের, নয় কুকুরের, নও অন্য কোন জীবের; কিন্তু আমার পুত্রের নহে। সে এত অল্পবয়সে মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে, ইহা একান্ত অসম্ভব। আমাদের বংশে সাত পুরুষের মধ্যে কাহারও অকালমৃত্যু ঘটে নাই; এখনও ঘটিতে পারে না। আপনি অধ্যাপক হইয়া কেন এরূপ অলীক কথা মুখে আনিতেছেন?"

"দ্বিজবর, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি প্রকৃতই মিথ্যা কথা বলিয়াছি। ধর্ম্মপালকুমারের মুখে শুনিয়াছিলাম, আপনার বংশে কেহই অল্পবয়সে মারা যায় নাই। ইহা সত্য কি না, জানিবার জন্য আমি এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে আসিয়াছি। আপনার কথায় বুঝিলাম, ধর্ম্মপালকুমার যাহা বলিয়াছে, তাহা মিথ্যা নহে। কিন্তু ইহা অতি বিস্ময়ের বিষয় এবং ইহার কোন বিশিষ্ট কারণ আছে। যদি দয়া করিয়া তাহা বুঝাইয়া দেন, তবে আমি কৃতার্থ হই।"

ধর্ম্মপালকুমারের পিতা নিম্নলিখিত কবিতা কয়টীতে এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন :—

ধর্ম্মপথে চলি, মিথ্যা নাহি বলি,	পাপাচার করি নিয়ত বর্জ্জন ;
অনার্য্য চিন্তায় মন নাহি ধায় ;	তাই তরুণের না হয় মরণ।
সদসৎ সদা করিয়া বিচার	অসতে আসক্ত হই না কখন ;
ত্যজিয়া অসৎ ভজি সদা সৎ ;	তাই তরুণের না হয় মরণ।
দানের পূর্ব্বেতে সুপ্রসন্ন মন ;	দানকালে প্রীতি প্রফুল্ল বদন ;
দিয়া অনুতাপ করি না কখন ;	তাই তরুণের না হয় মরণ।
অভ্যাগত জনে সেবি সযতনে ;	যথাসাধ্য করি দরিদ্রে পালন ;
পানীয়ে, আহারে তুষি সবাকারে ;	তাই তরুণের না হয় মরণ।
মাতা, পিতা, স্বসা, ভ্রাতা, দারা, সুত	ধর্ম্মপথে সবে করে বিচরণ ;
হ'য়ে সুসংযত পালে পুণ্যব্রত ;	তাই তরুণের না হয় মরণ।
ধর্ম্ম অকুশল নিবারে সকল	ছত্র রোধে যথা ধারা বরষার।
ধর্ম্মে সুরক্ষিত ধর্ম্মপাল মোর ;	মরেনি নিশ্চয় তনয় আমার।

ইহা শুনিয়া অধ্যাপক বলিলেন, "আমি অতি শুভক্ষণে এখানে আসিয়াছি। আজ আপনার কথা শুনিয়া আমি নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম। আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি।"

এক কৃতজ্ঞ রাজার কথা।

(১)

কাশীরাজ্যের এক প্রান্তে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছিল। রাজা বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া পরাস্ত হইলেন ; তাঁহার সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। রাজা আহত হইয়াছিলেন ; তিনিও প্রাণভয়ে রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

একে ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাব ; তাহার পর সমস্ত রাত্রি

অনাহারে ও অনিদ্রায় অশ্বপৃষ্ঠে পর্য্যটন। রাজা প্রাতঃকালে এমন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার আর চলিবার শক্তি রহিল না। তিনি সম্মুখে একখানি গ্রাম দেখিতে পাইলেন। সেই গ্রামের লোক রাজভক্ত, কি রাজদ্রোহী, তাহা তিনি জানিতেন না। তথাপি উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সেই খানেই আশ্রয় লইবার সঙ্কল্প করিলেন।

ঐ গ্রামে ত্রিশ ঘর লোক বাস করিত এবং তাহারা সকলেই রাজহিতৈষী ছিল। তাহারা সমবেত হইয়া গ্রামের কাজকর্ম্ম-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল, এমন সময়ে রাজা সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার যুদ্ধবেশ ও অশ্বের সাজসজ্জা দেখিয়া গ্রামবাসীদিগের অনেকেই ভয় পাইল এবং একজন কৃষক ব্যতীত অন্য সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। যে ব্যক্তি পলায়ন করিল না, সে রাজার সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, যুদ্ধের সংবাদ কি? রাজা না কি নিজেই যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন? তুমি তাঁহার স্বপক্ষে, না বিপক্ষে?" রাজা উত্তর দিলেন, "আমি রাজার পক্ষের লোক; যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইয়াছে; সেনা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে; আমিও আহত হইয়া পলায়ন করিয়াছি। কিন্তু এখন এমন ক্লান্ত হইয়াছি যে, আর চলিতে পারিতেছি না। তুমি আশ্রয় দিলে এ যাত্রা আমার প্রাণরক্ষা হয়।"

কৃষক বলিল, "আশ্রয় দিব না কেন? প্রাণ দিয়াও তোমায় রক্ষা করিব; ভয় নাই, তোমাকে কেহ ধরাইয়া দিবে না। এ গ্রামে আমরা সকলেই রাজভক্ত।"

অনন্তর কৃষক রাজাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল। আহার

যত্ন ও শুশ্রূষায় রাজা অল্পদিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিলেন এবং শরীরে বল পাইয়া বলিলেন, "ভাই, আমি সুস্থ হইয়াছি; এখন আমায় বিদায় দাও।" কৃষক বলিল, "তোমার স্ত্রীপুত্র তোমার জন্য কত ভাবিতেছে; কাজেই তোমাকে আর থাকিতে বলিব না। আমরা দরিদ্র; তোমার আহারাদির সম্বন্ধে অনেক ত্রুটি হইয়াছে। সে জন্য কিছু মনে করিও না। এই পুঁটুলিটা লও; ইহাতে কিছু চিড়া ও গুড় আছে; পথে ক্ষুধা পাইলে খাইও।"

রাজা বলিয়া গেলেন, "ভাই, আমার নাম মহাশ্বারোহ। রাজধানীতেই আমার বাড়ী। আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি একবার সেখানে যাইও। তুমি নগরের দক্ষিণ দ্বারে গিয়া দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেই সে আমার বাড়ী দেখাইয়া দিবে।"

রাজধানীতে প্রবেশ করিবার কালে রাজা দক্ষিণ দ্বার দিয়া গমন করিলেন এবং দৌবারিকের কাণে কাণে বলিয়া গেলেন "দেখ, বাপু, এক পল্লীবাসী কৃষক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, মহাশ্বারোহের বাড়ী কোথায়? তুমি তাহাকে আমার নিকট লইয়া যাইও।"

(২)

ইহার পর দুই তিন মাস কাটিয়া গেল, তথাপি সেই কৃষক রাজধানীতে গেল না। সে আসিল না দেখিয়া রাজা দুই তিন বার তাহার বাসগ্রামের কর বৃদ্ধি করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না।

পুনঃ পুনঃ করবৃদ্ধি হইল বলিয়া গ্রামবাসীরা বড় কষ্ট বোধ করিতে লাগিল। তাহারা সেই কৃষককে বলিল, "ভাই,

মহাশ্বারোহ তোমার বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার পর আমরা করভারে পীড়িত হইয়া মাথা তুলিতে পারিতেছি না। তিনি, বোধ হয়, রাজধানীর কোন বড় লোক। তুমি একবার তাঁহার নিকট গিয়া দেখ, তাহার সাহায্যে কর কমাইতে পার কি না।”

কৃষক বলিল, “আমি পাড়াগেঁয়ে লোক; রাজধানীর নাম শুনিলেই মনে বড় ভয় হয়। যাহা হউক, তোমরা দশজনে যখন বলিতেছ, তখন আমি যাইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি খালিহাতে যাইতে পারিব না। মহাশ্বারোহের স্ত্রী ও পুত্র আছেন। তাঁহাদিগকে উপহার দিতে হইবে। তোমরা তাহার যোগাড় কর।”

গ্রামবাসীরা এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তাহারা সকলেই দরিদ্র; কাজেই কোন বহুমূল্য উপহার সংগ্রহ করিতে পারিল না; তাহারা কৃষকের হাতে কয়েকটা রূপার মাদুলি এবং কয়েকখানি লালপেড়ে মোটা কাপড় আনিয়া দিল। এই সমুদায় ও গৃহজাত কিছু মিষ্টান্ন লইয়া কৃষক রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিল এবং দক্ষিণ দ্বারে গিয়া দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশ্বারোহের বাড়ী কোথায়?” “এস, দেখাইতেছি” বলিয়া দ্বারবান্ তাহাকে হাত ধরিয়া রাজভবনে লইয়া গেল এবং রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইল। রাজা বলিলেন, “কি সৌভাগ্য! আমার বন্ধু আসিয়াছেন। তাঁহাকে এখানে লইয়া এস।” অনন্তর তিনি নিজেও অগ্রসর হইলেন এবং কৃষককে দেখিবামাত্র আলিঙ্গন করিয়া, “তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? আমার বন্ধুপত্নী

কেমন আছেন? ছেলে মেয়েরা ভাল আছে, ত?” একসঙ্গে এইরূপ বহু প্রশ্ন করিলেন।

(৩)

রাজা কৃষকের হাত ধরিয়া বেদির উপর লইয়া গেলেন এবং তাহাকে সিংহাসনের এক পার্শ্বে বসাইলেন। অনন্তর তিনি মহিষীকে বলিলেন, “দেবি, ইনি আমার পরমবন্ধু। ইঁহার পা ধুইয়া দাও।” মহিষী তাহাই করিলেন—ধুইবার সময়ে রাজা নিজে সুবর্ণভৃঙ্গার হইতে জল ঢালিতে লাগিলেন।

এই সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া কৃষক তো অবাক্। সে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, “মহারাজ, রক্ষা করুন। আমি না জানিয়া কতই অপরাধ করিয়াছি! আপনাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি।” রাজা উত্তর দিলেন, “সে কি কথা? তোমাকে বন্ধু না বলিলে আর বন্ধু বলিব কাহাকে? এখন ওসব কথা রাখ। আমার জন্য কোনও খাবার জিনিষ আনিয়াছ কি না বল?” কৃষক একটু আশ্বস্ত হইয়া থলি হইতে মিষ্টান্ন বাহির করিল; রাজা উহা স্বুবর্ণ-পাত্রে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “এ অতি উপাদেয় খাদ্য; এস, আমরা সকলেই কিছু কিছু খাই।”

মিষ্টান্ন-ভোজন শেষ হইলে কৃষক রাজাকে সেই মোটা কাপড় কয়খানি ও রূপার মাদুলি কয়েকটা দিল। রাজা ও মহিষী বারাণসীজাত বস্ত্র ও বহুমূল্য আভরণ ত্যাগ করিয়া ঐ সকল পরিধান করিলেন। অনন্তর রাজার আদেশে ভৃত্যগণ কৃষককে স্নান করাইয়া বিচিত্র বসন-ভূষণে সুসজ্জিত করিল। রাজা তাহাকে অর্দ্ধরাজ্য দান করিলেন এবং তাহার স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতিকে আনাইয়া

তাহাদের বাসের জন্য এক রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। তাহার গ্রামবাসীরাও করভার হইতে মুক্ত হইল।

কৃষকের সৌভাগ্য দেখিয়া অমাত্যেরা ঈর্ষ্যায় পুড়িতে লাগিলেন। তাঁহারা একদিন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে বলিলেন, "কুমার, রাজা এই কৃষককে অর্দ্ধরাজ্য দিয়া ইহার সঙ্গে একত্র ভোজন ও উপবেশন করিতেছেন, আমাদিগকেও বলিয়াছেন, ইহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের যেন ত্রুটি না হয়। এ ব্যক্তি রাজার যে কি উপকার করিয়াছে, তাহা আমরা জানি না। যাহাই করুক না কেন, রাজার ব্যবহারে কিন্তু আমাদের বড় লজ্জা হইতেছে। কাজটা যে ভাল হইতেছে না, আপনি তাহা রাজাকে বুঝাইয়া বলুন।" কুমার অমাত্যদিগের কথায় সায় দিলেন এবং একদিন রাজাকে তাঁহাদের অসন্তোষের কারণ জানাইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, আমি যুদ্ধে আহত ও পরাজিত হইয়া কোথায় আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহা শুনিয়াছ কি?" কুমার উত্তর দিলেন, "না, বাবা; আমি তাহা জানি না" রাজা বলিলেন, "তখন এই কৃষকই আমায় আশ্রয় দিয়াছিল এবং ইহারই যত্নে ও সেবায় আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। এ সহায় না হইলে আমি সে যাত্রা নিশ্চয় মারা যাইতাম। যে আমার এত উপকার করিয়াছে, যাহার গুণে আমি বাঁচিয়া আছি, তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করিলে কি মনুষ্যত্ব থাকে?"

রাজার কথা শুনিয়া কুমার নিরুত্তর হইলেন; অমাত্যেরাও কোন অসন্তোষের চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন না।

অধ্যবসায়ের পুরস্কার।

ল'য়ে অল্প মূলধন   প্রচুর ঐশ্বর্য্য লভে
বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ জন ;
লইয়া স্ফুলিঙ্গমাত্র,   ফুৎকারে বাড়ায়ে তাবে
করে লোক মহাগ্নি সৃজন।

কাশীরাজের এক অতি বুদ্ধিমান্ অমাত্য ছিলেন। তিনি একদিন রাজদর্শনে যাইতেছিলেন ; অনেক কর্ম্মপ্রার্থী তাঁহার অনুগমন করিয়া স্ব স্ব অভাবের কথা জানাইতেছিল, এমন সময়ে পথে একটা মৃত মূষিক দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা দুরবস্থার কথা কি বলিতেছ ? যদি বুদ্ধি ও চেষ্টা থাকে, তবে এই মরা ইন্দুরটা লইয়াও ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারা যায় এবং সেই ব্যবসায় হইতেই লোকে ক্রমে ধনবান্ হইতে পারে।"

কর্ম্মপ্রার্থীদিগের মধ্যে এক ভদ্রবংশীয় অথচ নিঃস্ব যুবক ছিল। সে অমাত্যের কথা শুনিয়া ভাবিল, "ইনি তো না জানিয়া শুনিয়া কোন কথা বলেন না। দেখা যাউক এই মরা ইন্দুরটা লইয়া আমি নিজের কোন সুবিধা করিতে পারি কি না"। ইহা স্থির করিয়া সে ইন্দুরটা তুলিয়া লইয়া গেল।

নিকটে এক মুদি একটা বিড়াল পুষিয়াছিল। সে বিড়ালের জন্য খাবার খুঁজিতেছিল ; যুবকটীর হাতে মরা ইন্দুর দেখিয়া সে উহা এক পয়সায় খরিদ করিল। যুবক ঐ পয়সাটায় গুড় কিনিল এবং এক কলসী জল ও একটা গেলাস লইয়া, যেখানে মালাকারেরা ফুল লইয়া নগরে প্রবেশ করে, সেইখানে গিয়া বসিল। মালাকারেরা ফুল তুলিবার জন্য অনেক দূরে গিয়াছিল।

তাহারা ক্লান্ত হইয়া যেমন সেখানে উপস্থিত হইল, অমনি যুবক তাহাদিগকে একটু একটু গুড় ও এক এক গেলাস জল খাইতে দিল। ইহাতে তৃপ্ত হইয়া মালাকারেরা তাহাকে এক এক মুষ্টি ফুল দিয়া গেল।

এই ফুল বেচিয়া যুবক যে পয়সা পাইল, তাহা দিয়া পরদিন সে আরও বেশী গুড় কিনিল এবং ফুলের বাগানে গিয়া মালাকারদিগকে আবার খাওয়াইল। মালাকারেরা সেদিন তাহাকে এক গুচ্ছ ফুলগাছ দিল। সেগুলি বেচিয়া যুবক দুই আনা পাইল। এইরূপে কখনও ফুল, কখনও ফুলগাছ বেচিয়া দশ পনর দিনের মধ্যে যুবক দুই চারি টাকা পুঁজি করিল।

ইহার পর একদিন খুব ঝড় বৃষ্টি হইল; রাজার বাগানে বিস্তর শুক্না ও কাঁচা ডাল পালা ভাঙ্গিয়া পড়িল। মালী বেচারি কি উপায়ে ঐ আবর্জ্জনা সরাইবে, ইহা ভাবিতেছে, এমন সময়ে সেই যুবক তাহার নিকট গিয়া বলিল, "যদি তুমি আমাকে এ সমস্ত বিনামূল্যে লইতে দাও, তবে আমি বাগান পরিষ্কার করিয়া দিতে পারি।" মালী তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন যুবক পাড়ার ছেলেদিগকে ডাকিয়া তাহাদের হাতে এক একটা সন্দেশ দিয়া বলিল, "ভাই সকল, তোমরা আমার সঙ্গে চল; রাজার বাগানটা পরিষ্কার করিতে হইবে।" ছেলেরা সন্দেশ পাইয়া খুসী হইয়াছিল। তাহারা সমস্ত ডাল পালা তুলিয়া আনিয়া রাস্তার পাশে গাদা করিল। এদিকে, ঐ পাড়ার এক কুম্ভকারের কাষ্ঠের বড় অনটন হইয়াছিল। সে ডালের গাদাটা যোল টাকা দিয়া কিনিয়া লইল।

খরচ খরচা বাদে এইরূপে যুবকের হাতে বিশ টাকা জমিল। সে তখন এক নূতন উপায় বাহির করিল। বারাণসীতে পাঁচ শ ঘর ঘেসেড়া ছিল; তাহারা প্রতিদিন মাঠে ঘাস তুলিতে যাইত। যুবক নগরের বাহিরে বড় বড় কলসীতে জল রাখিয়া ঘেসেড়া-দিগকে পিপাসার সময়ে পান করাইতে লাগিল। ঘেসেড়ারা সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "আপনি আমাদের এত উপকার করিতেছেন। আমরা কিন্তু গরিব লোক; আমাদের কি সাধ্য যে, আপনার কোন উপকার করি? যদি কখনও প্রয়োজন হয়, দয়া করিয়া বলিবেন; আমরা যতদূর পারি, আপনার জন্য খাটিব।" যুবক বলিল, "তোমরা যে তুষ্ট হইয়াছ, ইহাতেই আমার সুখ। তোমাদের সাহায্য আবশ্যক হইলে নিশ্চয় জানাইব।"

একদিন যুবকের এক বন্ধু সংবাদ দিল, "ভাই, এক অশ্ব-বিক্রেতা বহু অশ্ব লইয়া কালই এ নগরে আসিবে।" এই কথা শুনিয়া যুবক ঘেসেড়াদিগকে বলিল, "ভাই সকল, তোমরা কাল আমাকে প্রত্যেকে দুই আঁটি ঘাস দিবে এবং আমার ঘাস বেচা শেষ না হইলে তোমাদের ঘাস বেচিবে না।" ঘেসেড়ারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহাই করিল। অশ্ববণিক্ আর কোথাও ঘাস না পাইয়া যুবকের নিকট হইতে হাজার আঁটি ঘাস এক শ টাকায় কিনিয়া লইল।

ইহার কিছুদিন পরে যুবক জানিতে পারিল, একখানা বড় জাহাজ মাল লইয়া বন্দরে আসিয়াছে। সে কালবিলম্ব না করিয়া একখানা ভাল গাড়ী ভাড়া করিল এবং সকলের আগে বন্দরে উপস্থিত হইল। অনন্তর সে সমস্ত মালের দর ঠিক

করিয়া বায়না করিল এবং একটা উৎকৃষ্ট তাঁবু খাটাইয়া তাহার মধ্যে বিশ্রাম করিতে লাগিল। সে তাঁবুর দ্বারে উত্তম পরিচ্ছদ পরাইয়া তিন জন দ্বারবান্ রাখিয়া দিল, এবং তাহাদিগকে বলিল, "কেহ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে, তোমরা হঠাৎ তাহাকে প্রবেশ করিতে দিবে না; বলিবে যে, আমি বড় ব্যস্ত আছি। শেষে পীড়াপীড়ি করিলে, আমার অনুমতি পাইবার ছলে ভিতরে আসিবে এবং তাহার পর বাহিরে গিয়া তাহাকে আমার নিকট আনিবে।"

বন্দরে বড় জাহাজ আসিয়াছে শুনিয়া পরদিন এক শত বণিক্ মাল কিনিবার জন্য সেখানে সমবেত হইল; কিন্তু যখন শুনিল, কোন মহাজন একাই সমস্ত মাল বায়না করিয়াছেন, তখন তাহারা অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই যুবকের শিবিরে উপস্থিত হইল। সেখানে শিবিরের শোভা ও দ্বারবান্দিগের পরিচ্ছদের ঘটা দেখিয়া তাহারা মনে করিল, ঐ মহাজন নিশ্চয় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তাহারা এক এক করিয়া যুবকের সঙ্গে দেখা করিল এবং মালের এক একটা অংশ পাইবার জন্য প্রত্যেকে এক হাজার টাকা লাভ দিল। এইরূপে কেবল বায়না করিয়া যুবক এক দিনে লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইল।

যুবক দেখিল, সেই অমাত্যের কথামত কাজ করাতেই তাঁহার অদৃষ্ট ফিরিয়াছে। এজন্য কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ সে পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া তাঁহাকে উপহার দিতে গেল। অমাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত টাকা কোথায় পেলে?" তখন যুবক, মরা ইন্দুর তুলিয়া লইবার পর কিরূপে সে তিন

চারি মাসের মধ্যে লক্ষপতি হইয়াছে, সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। অমাত্য দেখিলেন, ঐ যুবক যেমন বুদ্ধিমান্, তেমনই অধ্যবসায়ী। তিনি তাহার সহিত নিজের কন্যার বিবাহ দিলেন। তাঁহার অন্য সন্তান ছিল না বলিয়া এই কন্যাই শেষে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইল এবং তাঁহার মৃত্যুর পর যুবক অমাত্যের পদ লাভ করিল।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ।

(১)

কুরুক্ষেত্রে জয়ী হইলেন, রাজ্য লাভ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন ; কিন্তু ইহাতেও যুধিষ্ঠির শান্তি পাইলেন না। ক্ষণস্থায়ী রাজ্যের জন্য কুলক্ষয় করিলাম, ইহা ভাবিয়া তিনি নিরতিশয় মর্ম্মবেদনা ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে রাজ্য ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার পত্নী এবং অনুজেরাও তাঁহার অনুগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তখন মহাপ্রস্থানের আয়োজন হইল। তাঁহারা অর্জ্জুনের পৌত্র পরিক্ষিৎকে সিংহাসনে বসাইলেন, ব্রাহ্মণ ও দীনদুঃখী-দিগকে ভাণ্ডারের ধনরত্ন দান করিলেন ; এবং বল্কল পরিধান করিয়া হস্তিনাপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে যুধিষ্ঠির তাঁহার পশ্চাতে যথাক্রমে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী চলিলেন। একটী কুকুরও কোথা হইতে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিল।

তাঁহারা পর্য্যটন করিতে করিতে হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন। হিমালয় অতি উচ্চ ও বৃহৎ পর্ব্বত; ইহার অভ্যন্তর-ভাগ ও শিখরদেশ বারমাস তুষারে আচ্ছন্ন; তথাপি তাঁহারা সুমেরুতে যাইবার উদ্দেশ্যে হিমালয় অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুকুরটী তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়িল না।

দারুণ শীতে ও পথশ্রমে একে একে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, অর্জ্জুন ও ভীমের মৃত্যু হইল; কিন্তু যুধিষ্ঠির নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কুকুরটীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

যুধিষ্ঠির পরমধার্ম্মিক; তিনি মানবজীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ করিয়া স্বর্গাভিলাষী হইয়াছিলেন; এজন্য দেবতারা স্থির করিলেন, যাহা পূর্ব্বে কোন মানবের ভাগ্যে ঘটে নাই, তাঁহাকে সেই পুরস্কার দিতে হইবে—তিনি সশরীরেই স্বর্গে যাইবেন। তাঁহারা রথ লইয়া যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন. "মহারাজ, আপনি এই রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে চলুন।" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমার পত্নী ও অনুজেরা পথে পড়িয়া রহিলেন; তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমার স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা নাই।" দেবরাজ তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন,—বলিলেন, "তাঁহাদের সকলেরই কিছু না কিছু পাপ ছিল, এইজন্য তাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁহারা সকলেই স্বর্গবাসী হইয়াছেন। অতএব আপনি স্বর্গে গেলেই তাঁহাদের দেখা পাইবেন।" তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এই কুকুরটী আমার অনুগত; এ হস্তিনাপুর হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে

আসিয়াছে; ক্ষণকালের জন্যও আমার কাছ-ছাড়া হয় নাই। অতএব অনুমতি করুন যে, আমার সঙ্গে এও স্বর্গে যাইতে পারে।”

দেবরাজ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ঘৃণার ভাব দেখাইলেন এবং বারবার বলিতে লাগিলেন যে, কুকুর অতি অপবিত্র জন্তু; উহাকে স্পর্শ করিলেও পাপ হয়; কাজেই উহাকে কিছুতেই স্বর্গে লইয়া যাইতে পারা যায় না। কিন্তু যুধিষ্ঠির কিছুতেই কুকুরটীকে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, “এই দুর্ব্বল ও শরণাগত জীবটীকে পরিত্যাগ করিলে অতি নৃশংসের কার্য্য হইবে। আমি নিজেব সুখের জন্য কখনই ইহাকে ছাড়িয়া যাইব না। ইহাতে যদি স্বর্গলাভ করিতে না পারি, তাহাতেও আমার দুঃখ নাই।”

এই উত্তর শুনিয়া কুকুরটী তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন “বৎস, আমি কুক্কুর নহি। আমি ধর্ম্ম; কুক্কুররূপ ধরিয়া তোমার পরীক্ষা করিলাম। সর্ব্বজীবে তোমার সমান দয়া; অতএব তুমি স্বর্গলাভের অধিকারী।” ধর্ম্মের বাক্য শেষ হইবামাত্র দেবতারা যুধিষ্ঠিরকে মহাসমাদরে স্বর্গে লইয়া গেলেন।

(২)

যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়া দেখিলেন, দুর্য্যোধন দিব্য সুখ ভোগ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতারা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা কেহই সেখানে নাই। দুর্য্যোধন বহু পাপ করিয়াও স্বর্গ লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার ভ্রাতারা পুণ্যশীল হইয়াও সেখানে স্থান

পান নাই, ইহা ভাবিয়া যুধিষ্ঠির বড় দুঃখিত হইলেন। দেবতারা তাঁহাকে বুঝাইলেন, দুর্য্যোধন সম্মুখযুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কাজেই তিনি স্বর্গবাসী হইয়াছেন; আর ভীম প্রভৃতি প্রাকৃত জনের ন্যায় জরার প্রভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, কাজেই তাঁহারা এ পুরস্কার লাভ করেন নাই। তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আমার ভ্রাতারা কোথায়? তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া স্বর্গে বাস করিলে আমার কি লাভ? তাঁহারা যেখানে আছেন, সেই আমার স্বর্গ। অতএব আমাকে সত্বর সেখানে লইয়া চলুন।" ইহা শুনিয়া এক দেবদূত তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিলেন। সে পথ অতি দুর্গম ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাহা তীক্ষ্ণধার ক্ষুরে আকীর্ণ; কৃমিকীটে পরিপূর্ণ ও পূতিগন্ধযুক্ত। তাহার উভয় পার্শ্বে দুঃসহ অগ্নি জ্বলিতেছে, মধ্যে মধ্যে তপ্তজলপূর্ণ নদী রহিয়াছে, কোথাও লৌহ কলসে তৈল ফুটিতেছে এবং পাপীরা তাহাতে নিমগ্ন হইয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতেছে।

এই পথে যাইতে যাইতে যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতাদিগের করুণ বিলাপ শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, 'হে দয়াময় যুধিষ্ঠির, আপনি এখানে আসিবামাত্র আমাদের যন্ত্রণার উপশম হইয়াছে। অতএব আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন না।" ইহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির দেবদূতকে বলিলেন, "ভদ্র, তুমি দেবরাজকে গিয়া বল, আমি এখানেই থাকিলাম, স্বর্গে আমার প্রয়োজন নাই।"

কিন্তু যুধিষ্ঠির যেমন এই কথা বলিলেন, অমনি মায়াজাল দূর হইল, সুশীতল সুগন্ধ বায়ু বহিতে লাগিল। দেবরাজ

আবার যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা লইতেছিলেন। যুধিষ্ঠির সে পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইলেন। ইহার পর তিনি মন্দাকিনীর জলে অবগাহন করিয়া দিব্য দেহ ধারণ করিলেন এবং মাতা, পিতা, ভ্রাতা, জায়া প্রভৃতিব সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

ধ্রুব।

(১)

পুরাকালে উত্তানপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। তখনকার অনেক লোকের একটা মুখ্য দোষ ছিল যে, তাঁহারা এক স্ত্রী জীবিত থাকিতেই অন্য স্ত্রী বিবাহ করিতেন। উত্তানপাদও এ দোষ এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর নাম সুনীতি; দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম সুরুচি।

সুরুচির চক্রান্তে কিছুদিনের মধ্যে উত্তানপাদ সুনীতির উপর বিরূপ হইলেন; এমন কি, শেষে তাঁহাকে রাজভবন হইতে দূর করিয়া দিলেন। দুঃখিনী বনে গিয়া একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন এবং সেখানে একটী পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রটীর নাম হইল ধ্রুব।

ক্রমে ধ্রুবের বয়স্ পাঁচ বৎসর হইল। এত অল্প বয়সেই তিনি মাতার শিক্ষাবলে বহুবিধ সদ্‌গুণ লাভ করিলেন। তাঁহার মুখে মিথ্যা বা কটু কথা ছিল না, মনে কপটতা ছিল না। মাতা যে উপদেশ দিতেন, তিনি একমনে তাহা শুনিতেন, এবং সেই মত চলিতেন। তিনি যে উত্তানপাদের পুত্র, সুনীতি

তাঁহাকে অনেক দিন এ কথা জানিতে দেন নাই। তিনি মুনি-বালকদিগের সঙ্গে খেলা করিতেন এবং ভাবিতেন, তিনিও তাহাদের মত এক মুনিবালক।

এক দিন খেলা করিবার সময়ে মুনিবালকেরা ধ্রুবকে তাঁহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর দিতে না পারিয়া বড় অপ্রতিভ হইলেন এবং মাতার কাছে গিয়া নিজের লজ্জার কথা জানাইলেন। সুনীতি বলিলেন, "বাছা, তুই অতি বিখ্যাত বংশে জন্মিয়াছিস্; মহারাজ উত্তানপাদ তোর পিতা। আমার মত অভাগিনীর গর্ভে জন্মিয়াছিস্ বলিয়াই তোকে এই বনবাসের ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে।"

এই কথা শুনিয়া ধ্রুব পিতৃদর্শনে যাত্রা করিলেন। উত্তান-পাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ধ্রুব গিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। উত্তানপাদ তাঁহাকে দেখিবামাত্র নিজের পুত্র বলিয়া চিনিতে পারিলেন। ধ্রুবও তাঁহার কোলে উঠিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন; কিন্তু সেই সময়ে সুরুচি সেখানে গিয়া বলিলেন, "তোমার এ দুরাশা কেন? যে সুনীতির ন্যায় নীচা নারীর সন্তান, সে কি উচ্চাসনে বসিবার উপযুক্ত?" উত্তানপাদ সুরুচির ভয়ে এই অন্যায় ভর্ৎসনার প্রতিবাদ করিলেন না।

(২)

বিমাতার দুর্ব্বাক্য শুনিয়া এবং পিতার অবহেলা দেখিয়া ধ্রুবের বড় অভিমান হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজসভা ত্যাগ করিয়া বনে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া

সুনীতি বলিলেন, "সুরুচি সত্যই বলিয়াছেন; আমি নিতান্ত অভাগিনী; আর আমার গর্ভে জন্মিয়াছিস্ বলিয়া তুইও ভাগ্য-হীন। সুরুচি পূর্ব্বজন্মে পুণ্য করিয়াছিলেন; কাজেই তিনি রাজার প্রিয়; আমি পূর্ব্বজন্মে পাপ করিয়াছিলাম, সেই নিমিত্ত আমার এ দুর্দ্দশা। কিন্তু ইহার জন্য দুঃখ করা উচিত নহে; তুই পুণ্য সঞ্চয় কর্; তাহা করিলে সুখী হইতে পারিবি।" ধ্রুব বলিলেন, "মা, আমি তাহাই করিব; আমি অন্য সুখ চাই না; আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন এমন স্থান পাই, যাহা বাবাও পাইতে পারেন নাই।"

ইহা বলিয়া ধ্রুব কুটীর হইতে বাহির হইলেন এবং পূর্ব্ব-দিকে বহুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, একস্থানে সাত জন ঋষি কুশাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণের ন্যায়, পরিধানে গৈরিক বসন; গলে তুলসীর মালা ও যজ্ঞোপবীত। ধ্রুব ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলে ঋষিরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কে? এখানে কি জন্য আসিয়াছ?" ধ্রুব উত্তর দিলেন, "আমি মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র; বিমাতার ও পিতার নিষ্ঠুর ব্যবহারে মনে বড় ব্যথা পাইয়াছি। সেইজন্য আপনাদের শরণ লইলাম। মা বলিয়াছেন, পুণ্য সঞ্চয় করিলে আমি সুখী হইতে পারিব। আপনারা দয়া করিয়া আমাকে পুণ্যসঞ্চয়ের পথ দেখাইয়া দিন; আমি সেই পথে চলিয়া যেন এমন স্থান লাভ করিতে পারি, যাহা আর কোন মানুষের ভাগ্যে ঘটে নাই।"

ঋষিরা বলিলেন, "তোমার মাতা অতি উত্তম উপদেশ

দিয়াছেন। তোমার সঙ্কল্প শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি একাগ্রচিত্তে ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা কর। তিনি পরম-দেবতা; তাঁহার সেবাই প্রধান পুণ্য। তিনি পরিতুষ্ট হইলে, তুমি যাহা চাও, তাহাই পাইবে।” অনন্তর তাঁহারা, কি উপায়ে বিষ্ণুর পূজা করিতে হয়, ধ্রুবকে তাহা শিক্ষা দিলেন।

(৩)

পাঁচ বৎসরের শিশু এইরূপে তপস্বী হইলেন। তিনি পুণ্য তীর্থ মথুরায় গিয়া সেখানে যমুনার তীরে কোন নির্জ্জন স্থানে একমনে ভগবান্ বিষ্ণুকে ডাকিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গেলেন, পৌষ-মাঘের দারুণ হিম, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড রৌদ্র, আষাঢ়-শ্রাবণের অবিরাম বৃষ্টি তাঁহার মাথার উপর দিয়া গেল ; কিন্তু সে দিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই ; কি করিলে বিষ্ণু প্রসন্ন হইবেন, তিনি কেবল সেই চিন্তাতেই মগ্ন।

তখন কোন মানুষকে তপস্যা করিতে দেখিলে ইন্দ্র বড় ভয় পাইতেন ; কারণ, তিনি বহুবার দেখিয়াছিলেন যে, এইরূপ তপস্যা করিয়া কেহ কেহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিবের কাছে এমন এক একটা বর পাইয়াছিল যে, তাহার বলে শেষে তাঁহার ইন্দ্রত্ব লইয়াও টানাটানি করিয়াছিল। তিনি ধ্রুবের উদ্দেশ্য জানিতেন না ; ভাবিলেন, ‘এও বুঝি ঐরূপ একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে।’ এই কারণে তিনি ধ্রুবের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন ; এমন কি, একবার সুনীতির বেশ ধরিয়া তাঁহাকে নিরস্ত হইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু কিছুতেই ধ্রুবের মন টলিল না।

ধ্রুবের একাগ্রতা দেখিয়া ভক্তবৎসল ভগবানের দয়া হইল। তিনি তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি কি চাও, বল ; তুমি যে ইচ্ছা করিবে, আমি তাহাই পূরণ করিব।"

ধ্রুব বলিলেন, "আমি বালক ; কি বলিয়া আপনার স্তব করিতে হয়, তাহা জানি না। দয়া করিয়া এই শিক্ষা দিন, যেন আপনার মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারি।" এই উত্তরে ভগবান্ আরও সন্তুষ্ট হইলেন ; তিনি বলিলেন, "তুমি যে স্থানের অভিলাষী, তাহাই পাইবে। যে নক্ষত্র নভোমণ্ডলে নিয়ত নিশ্চলভাবে বিরাজ করিতেছে, অন্য সকল জ্যোতিষ্ক যাহাকে প্রতিদিন এক একবার প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া মনে হয়, তুমি সেই নক্ষত্রলোকে অবস্থিতি করিবে ; এবং তোমারই নামানুসারে ঐ নক্ষত্র ধ্রুব নামে পরিচিত হইবে। তুমি বনের মধ্যে যে সাত জন ঋষিকে দেখিয়াছিলে, তাঁহারাও তোমার দৃষ্টিপথের মধ্যে থাকিয়া এক একটী নক্ষত্রে বাস করিবেন।"

☞ ধ্রুব নক্ষত্র বাহির করিতে হইলে সপ্তর্ষিমণ্ডল কোথায় তাহা জানা আবশ্যক। সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুব আকাশের উত্তর ভাগে এইরূপ দেখায় :—
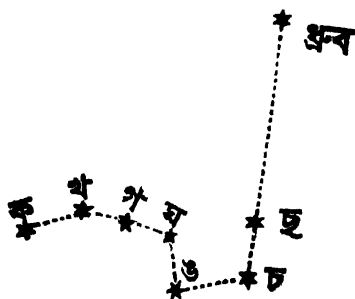
যে কোন সময়ে চ ও ছ চিহ্নিত নক্ষত্র একটী সরল রেখাদ্বারা যোগ

করিয়া উহা বর্দ্ধিত করিলে ধ্রুব নক্ষত্রকে স্পর্শ করিবে। ধ্রুব শব্দের অর্থ স্থির, নিশ্চল, নিশ্চয়। সপ্তর্ষির নাম মরিচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, বসিষ্ঠ। বসিষ্ঠের পাশে একটী ছোঁট নক্ষত্র আছে ; উহার নাম অরুন্ধতী।

প্রহ্লাদ।

(১)

আজ বহু লক্ষ বৎসরের কথা—তখন হিরণ্যকশিপু-নামক এক দৈত্য এই পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। তিনি যখন ব্রহ্মার নিকট বর পাইলেন যে, জগতে যে সকল প্রাণী আছে, কেহই তাঁহাকে বধ করিতে পারিবে না, তখন তিনি অতি দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এত দর্প হইল যে, মানুষ ত তুচ্ছ, তিনি দেবতাদিগকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমিই জগতের প্রভু ; লোকে আমাকে পূজা না করিয়া হরিকে পূজা করে কেন ?'

কালক্রমে হিরণ্যকশিপুর একটী পুত্র জন্মিলেন। ঐ পুত্রের নাম প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ শিশুকাল হইতেই হরিভক্ত ছিলেন। যাহাতে হরির প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ জন্মে, হিরণ্যকশিপু সেইজন্য কত চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মতিপরিবর্ত্তন হইল না। ষণ্ড ও অমর্ক নামক দুইজন শিক্ষক তাঁহাকে নিয়ত উপদেশ দিতেন, "বৎস, তুমি পিতার অবাধ্য হইও না ; তিনিই তোমার পরমদেবতা ; অন্য কোন দেবতা তাঁহার সমকক্ষ নহেন।" কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হইল না ; বরং প্রহ্লাদের হরিভক্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি নিজে একমনে হরিকে

ডাকিতেন, সমবয়স্ক অন্য বালকদিগকেও হরিভক্তি শিক্ষা দিতেন।

(২)

হিরণ্যকশিপু দেখিলেন, প্রহ্লাদ নিজে মজিয়াছেন, অন্যকেও মজাইতে বসিয়াছেন ; অতএব তাঁহার প্রাণনাশ করাই কর্ত্তব্য। এই নিষ্ঠুর সঙ্কল্প করিয়া তিনি একদিন প্রহ্লাদের খাদ্যে হলাহল মিশাইয়া দিলেন ; কিন্তু হরির ইচ্ছায় ঐ হলাহল অমৃতে পরিণত হইল ! ইহার পর প্রহ্লাদের বুকে পাষাণ বান্ধিয়া তাঁহাকে সমুদ্রে ফেলা হইল ; কিন্তু তিনি হরিগুণ গান করিতে করিতে জলের উপর ভাসিতে লাগিলেন ! তিনি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলেন, কিন্তু হরির মহিমায় ঐ অগ্নি তুষারের মত শীতল হইয়া তাঁহার সন্তাপ হরণ করিল !

এই সকল অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়াও হিরণ্যকশিপুর চৈতন্য হইল না। তিনি প্রহ্লাদকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুই সর্ব্বদা হরি হরি বলিস্ ; তোর হরি থাকে কোথায় ?"

প্রহ্লাদ বলিলেন, "বাবা, তিনি সব যায়গায় আছেন ; ভিতরে, বাহিরে, জলে, স্থলে, আকাশে, পাতালে—এমন স্থান নাই, যেখানে হরি না আছেন।" এই উত্তরে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া হিরণ্যকশিপু সভামণ্ডপের একটা স্তম্ভের দিকে অঙ্গুলি ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর হরি কি এই থামটার ভিতরেও আছে ?" প্রহ্লাদ বলিলেন, "হাঁ বাবা ; তিনি ঐ থামের মধ্যেও আছেন।" তখন হিরণ্যকশিপু রক্তজবার মত চক্ষু দুইটী ঘূরাইতে ঘূরাইতে ঐ স্তম্ভে পদাঘাত করিলেন।

অমনি ভয়ঙ্কর শব্দে উহা ভাঙ্গিয়া গেল এবং ভগ্নস্থান হইতে অর্দ্ধনর, অর্দ্ধসিংহ এক ভীষণ জীবের আবির্ভাব হইল। এই নৃসিংহের গর্জ্জনে ত্রিভুবন কম্পিত হইতে লাগিল; তাঁহার পা দুখানি রহিল মহীতলে, কেশর ঠেকিল গিয়া নভোমণ্ডলে। ব্রহ্মা যখন হিরণ্যকশিপুকে বর দিয়াছিলেন, তখন জগতে ওরূপ কোন জীবের আবির্ভাব হয় নাই; এখন নৃসিংহের সুতীক্ষ্ণ নখপ্রহারে হিরণ্যকশিপুর কুক্ষি বিদীর্ণ হইল; তিনি দৈত্যলীলা সংবরণ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

প্রহ্লাদ বুঝিলেন, এ তাঁহার হরিরই লীলা—হরিই নরসিংহ-রূপ ধারণ করিয়া পাষণ্ডের প্রাণ সংহার করিলেন। তিনি ভক্তিভরে নরসিংহের স্তব করিতে লাগিলেন; নরসিংহও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। প্রহ্লাদ বলিলেন, "প্রভো, এই বর দিন, যেন চিরকাল আপনার পাদপদ্মে মতি স্থির থাকে এবং আমার পিতার সদ্গতি হয়।"

এত কাল গিয়াছে, তথাপি লোকে এখনও প্রহ্লাদের গুণ গান করে, এখনও কোন পাপীর গৃহে সৎপুত্র জন্মিলে, তাহাকে 'দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ' বলিয়া থাকে

কৃপণের শাস্তি।

(১)

রাজগৃহ নগরের নিকটে মৎসরী নামে এক প্রভূত-ধনশালী, অথচ নিতান্ত কৃপণ শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তিনি যাচকদিগকে তৃণাগ্রেও তৈলবিন্দু দান করিতেন না, ভিক্ষার্থীদিগকে তাড়াই-

বার জন্য দ্বারদেশে প্রহরী রাখিতেন এবং অধমর্ণদিগের নিকট হইতে কড়ায় গণ্ডায় সুদ আদায় করিতেন। তাঁহার দেহখানিও তাঁহার মনের অনুরূপ ছিল। তিনি একে খর্ব্বকায় ও লম্বোদর, তাহার উপর আবার খঞ্জ, কুব্জ ও টেরচক্ষু ছিলেন। তাঁহার পিতা কিন্তু মহাদানশীল ছিলেন এবং সেই পুণ্যবলে মৃত্যুর পর ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মৎসরী ভাবিতেন, 'আমার পিতা অতি নির্ব্বোধের কাজ করিয়াছেন; তিনি যদি সঞ্চয় করিয়া যাইতেন, তবে আজ ভাণ্ডারে অর্থ রাখিবার স্থান হইত না। অর্থ যদি দান করিয়াই উড়াইয়া দিলাম, তবে এত কষ্টে অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন কি?'

কালক্রমে মৎসরীর ভাণ্ডারে অশীতি কোটি সুবর্ণ সঞ্চিত হইল; কিন্তু ইহাতেও তাঁহার আশা মিটিল না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, তিনি নিজে উহা ভোগ করিতেন না; পুত্রকলত্র-দিগকেও ভোগ করিতে দিতেন না। উহা কুক্কুরলব্ধ নারিকেলের মত কাহারও ব্যবহারে লাগিত না।

এক দিন মৎসরী একখানি জীর্ণ গোশকটে আরোহণ করিয়া রাজদর্শনে যাইতেছিলেন। পথে তাঁহার এক আত্মীয় বাস করিতেন। তিনি ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবার জন্য সেই আত্মীয়ের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই ব্যক্তি তখন মধু ও শর্করা-সহযোগে পায়স ভোজন করিতেছিলেন। তিনি মৎসরীকে দেখিয়া "আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহাকেও পায়স খাইতে অনুরোধ করিলেন। পায়স দেখিয়া মৎসরীর মুখে জল আসিয়াছিল। কিন্তু তিনি

ভাবিলেন, 'এখন পায়স খাইলে, ইনি যখন আমার গৃহে যাইবেন, তখন ভদ্রতার অনুরোধে ইঁহাকেও ত পায়স খাওয়াইতে হইবে। কেবল ইঁহাকে খাওয়াইলেই যে নিস্তার পাইব, তাহা নহে, পরিজনেরাও খাইতে চাহিবে; কাজেই ধনক্ষয় হইবে।' মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া মৎসরী বলিলেন, "না ভাই, আমি এইমাত্র আহার করিয়া আসিতেছি; তুমি খাও, আমি বসিয়া দেখি।" কিন্তু মুখে অনিচ্ছা দেখাইলেও তিনি মনের লোভ দমন করিতে পারিলেন না।

গৃহে ফিরিবার পর মৎসরীর পায়স খাইবার ইচ্ছা আরও বলবতী হইল; কিন্তু তণ্ডুলাদি উপকরণের অপচয় আশঙ্কা করিয়া তিনি মনের ভাব চাপিয়া রাখিলেন; মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

(২)

ক্রমাগত ইচ্ছ-দমনের চেষ্টায় মৎসরী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। এক দিন তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার ভার্য্যা তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্যপুত্র, আপনার কি কোন অসুখ করিয়াছে?" মৎসরী উত্তর দিলেন, "অসুখ করুক তোমার; আমার অসুখ করিবে কেন?"

"তবে কি কোন দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে? রাজা কুপিত হইয়াছেন না কি?"

"রাজা কুপিত হইবেন কেন?"

"ছেলেরা কোন দুর্ব্ব্যবহার করে নাই ত?"

"না।"

"কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে কি?"

মৎসরী এবার নিরুত্তর রহিলেন। তখন, তিনি কি খাইতে চান, জানিবার নিমিত্ত গৃহিণী পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। কাজেই সাত পাঁচ ভাবিয়া মৎসরীকে বলিতে হইল, "মধু ও শর্করা-মিশ্রিত পায়স খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া সেই রমণী ক্রোধভরে বলিলেন "হা দুরদৃষ্ট! আপনার অভাব কি, বলুন ত? আমি এখনই এত পায়স পাক করিয়া দিতেছি যে, গ্রামের সমস্ত লোকেও খাইয়া ফুরাইতে পারিবে না।" মৎসরী বলিলেন, "তোমার ভাণ্ডারে বুঝি ধন রাখিবার স্থান নাই! ধন যদি পিত্রালয় হইতে আনিয়া থাক, তবে, যত ইচ্ছা, পায়স প্রস্তুত করিয়া গ্রাম-সুদ্ধ কেন, দেশ-সুদ্ধ লোককে খাওয়াইতে পার।"

"না হয় পাড়ার কয় জনকে খাওয়াইব।"

"পাড়ার লোকের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি, বল ত? তুমি যে দেখিতেছি, কল্পতরু হইয়া বসিয়াছ!"

"অন্ততঃ বাড়ীর লোক কয়টাকে ত একটু একটু দিতে হইবে?"

"বাড়ীর সব লোককে ইহার মধ্যে টানিয়া আনিতেছ কেন?"

"বেশ, কেবল আপনার জন্যই আয়োজন করিতেছি।"

"এখানে আয়োজন করিলে চলিবে না। আয়োজন করিতে গেলেই বাড়ীর রামা, শ্যামা কত লোকে দেখিবে। তুমি আমাকে কিছু চাউল, একটু দুধ, একটু চিনি, একটু মধু, আর

পাক করিবার জন্য একটা ছোট পাত্র দাও। আমি নিজে রান্ধিয়া বন ভোজন করি গিয়া।”

গৃহিণী ঐ সকল উপকরণ দিলেন; মৎসরী সেগুলি লইয়া নদীর ধারে একটা গুল্মের অন্তরালে চুল্লী প্রস্তুত করিয়া পায়স পাক করিতে বসিলেন।

(৩)

ইন্দ্র অমরাবতীতে বসিয়া এই কাণ্ড দেখিতেছিলেন। তিনি মৎসরীকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারই বেশ ধরিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করিলেন। সেই কুব্জ পৃষ্ঠ, সেই লম্বোদর, সেই টের চক্ষু, সেই খর্ব্ব কায়—কোন অংশেই মৎসরীর সহিত তাঁহার আকারে প্রভেদ রহিল না। তিনি রাজার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, “মহারাজ, আমি তপস্যা করিবার জন্য বনে যাইব। ভাণ্ডারে অশীতি কোটি সুবর্ণ আছে; যদি ইচ্ছা করেন, আপনি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন।”

মৎসরীর অকস্মাৎ এইরূপ মতি-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, “তোমার ধন আমি গ্রহণ করিব কেন?”

“তবে অনুমতি দিন, আমি ইহা যথারুচি দান করিয়া যাই।”

“তুমি স্বচ্ছন্দে দান কর; আমার কোন আপত্তি নাই।”

“যে আজ্ঞা, মহারাজ!”

ইহা বলিয়া ছদ্মবেশী ইন্দ্র মৎসরীর গৃহে গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পরিজনবর্গ ছুটিয়া আসিল। তিনি যে মৎসরী নহেন, কাহারও মনে এ সন্দেহ হইল না। তিনি দ্বারবান্‌কে

আদেশ দিলেন, "শুন; দেখিতে ঠিক আমারই মত, এমন কেহ যদি বাড়ীর ভিতরে যাইতে চায়, তবে তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া দূর করিয়া দিবে।" অনন্তর তিনি মৎসরীর পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমি অর্থ-সঞ্চয়ের জন্য অনেক পাপ করিয়াছি। এজন্য এখন বড় অনুতাপ হইতেছে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে এস, আমরা মুক্তহস্তে দান করিতে প্রবৃত্ত হই।" গৃহিণী ভাবিলেন, পায়স খাইয়া বুঝি মৎসরীর মন খুলিয়া গিয়াছে। তিনি উত্তর দিলেন, "আপনার ধন আপনি বিতরণ করিবেন; আমার তাহাতে অসাধ কি?" তখন ইন্দ্র প্রচার করিলেন, "আমার সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দিলাম; যে যত পারে, লইয়া যাউক।"

লোকে নিমিষের মধ্যে এই সংবাদ পাইল; কেহ ধামা, কেহ ঝুড়ি, কেহ থলি লইয়া মৎসরীর গৃহে উপস্থিত হইল এবং সোণা, রূপা, ধান, চাউল ইত্যাদি যে যাহা পাইল, লইয়া চলিল। এক কৃষক কোন পাত্র আনে নাই; সে মৎসরীরই একখানা শকট টানিয়া বাহির করিল, তাঁহারই গোশালা হইতে এক যোড়া বলদ আনিয়া তাহাতে যুতিল এবং শকটখানি নানা দ্রব্যে পূর্ণ করিয়া নিজের গ্রামের দিকে হাঁকাইয়া চলিল। পথে যাহার সঙ্গে দেখা হইল, সে তাহাকেই বলিতে লাগিল, "মৎসরী শ্রেষ্ঠী সুখে থাকুন; আমার মাথায় যত চুল আছে, তত বৎসর তাঁহার পরমায়ুঃ হউক। এ গরু তাঁহার, এ গাড়ী তাঁহার, এ সোণা, রূপা, ধান, চাউল তাঁহার। তিনি যাহা দিলেন, তাহাতে আমি পায়ের উপর পা রাখিয়া চিরদিন সুখে কাটাইব।"

(৪)

এইরূপে মৎসরীর গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে কৃষক যখন সেই গুল্মের নিকট উপস্থিত হইল, তখন মৎসরীর পায়স-ভোজন শেষ হইয়াছিল। তিনি গুল্মের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই গাড়ী ও গরু তাঁহার। তিনি গরু দুইটার নাকের দড়ি ধরিয়া বলিলেন, "তবে রে বেটা চোর! তুই আমার গাড়ী গরু লয়ে কোথায় যাচ্ছিস্!" কৃষকও গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং তাঁহার মস্তকে বজ্রমুষ্টি প্রহার করিয়া বলিল, "তবে রে পাজি! 'মৎসরী শ্রেষ্ঠী ধন দিয়াছেন। তুই চোর বলিবার কে রে!"

মৎসরী কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহের দিকে ছুটিলেন। লোকে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া যাইতেছে দেখিয়া, তিনি যা'কে তা'কে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ব্যাপার কি? রাজা কি আমার ভাণ্ডার লুঠ করিতে বলিয়াছেন?" কিন্তু তিনি যাহাকে ধরিলেন, সেই তাঁহাকে উত্তম মধ্যম দিয়া চলিয়া গেল। তিনি ক্ষত-বিক্ষত দেহে গৃহে প্রবেশ করিতে গেলেন। দ্বারবানেরা তাঁহাকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিল।

মৎসরী তখন নিরুপায় হইয়া রাজার শরণ লইলেন। তিনি রাজদ্বারে গিয়া, "রক্ষা করুন, মহারাজ! আপনি কি অপরাধে আমার সর্ব্বস্ব লুঠ করাইতেছেন?" বলিয়া বার বার চীৎকার করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, "এ কি কথা, শ্রেষ্ঠিন্? আমি কেন তোমার সম্পত্তি লুঠ করাইব? তুমি নিজেই না এই মাত্র বলিয়া গেলে যে, তুমি তপস্যার জন্য বনে যাইবে

এবং যাইবার পূর্ব্বে ধন দান করিবে। তাহার পর শুনিলাম, তুমি লোকজনকে খবর দিয়া ধন বিতরণ করিতেছ।" মৎসরী বলিলেন, "আমি কখনও আপনার নিকট এমন কথা বলিতে আসি নাই। আমি কেমন কৃপণ, তাহা তো আপনার অগোচর নাই। যে আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে, আপনি তাহাকে এখানে আনাইয়া বিচার করুন। এ নিশ্চয় কোন মায়াবীর কাণ্ড।"

রাজা ছদ্মবেশী ইন্দ্রকে আনাইলেন। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, মৎসরীর সহিত তাঁহার আকৃতিগত কোন প্রভেদ নাই। তখন প্রশ্ন উঠিল, প্রকৃত মৎসরী কে? শ্রেষ্ঠীর পত্নী, পুত্র প্রভৃতি পরিজনেরা সকলেই দৈব-প্রভাবে ইন্দ্রকে মৎসরী বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। অনন্তর শ্রেষ্ঠীর মনে হইল, তাঁহার মাথায় একটা আঁচিল আছে; নাপিত ভিন্ন অন্য কেহ তাহা জানে না। অতএব নাপিতের সাক্ষ্য লইলে জাল মৎসরী ধরা পড়িবে। তাঁহার প্রার্থনামত রাজা নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রকৃত মৎসরী কে, তাহা তুমি নির্দ্দেশ করিতে পার কি?" নাপিত বলিল, "ইঁহাদের মাথা দেখিলে, বোধ হয়, বলিতে পারি।" কিন্তু ইন্দ্র দৈবশক্তিবলে তৎক্ষণাৎ নিজের মস্তকে একটা চর্ম্মকীল উৎপাদন করিলেন। কাজেই নাপিতের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সে অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "মহারাজ, আমি অপারক হইলাম। এরা

দুটোই টেরা, দুটোই কুঁজো, (এদের) দুটোরই খোঁড়া পা;
দুটোর মাথায় সমান আঁচিল; (কিছু) বুঝ্‌তে পারি না।"

নাপিতের কথায় মৎসরীর শেষ আশা বিলুপ্ত হইল; তিনি

ধনশোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন ইন্দ্র ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি মৎসরী নহি, এই কুলাঙ্গারের পিতা; পুণ্যবলে মৃত্যুর পর ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি।" এদিকে লোকে মৎসরীর মুখে চোকে জল ছিটাইয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিল। ইন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পাপিষ্ঠ, কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থ-সঞ্চয়কেই জীবনের প্রধান ব্রত করিয়াছ! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ দানশীলতার গুণে স্বর্গলাভ করিয়াছেন; আমি ইন্দ্রত্ব পাইয়াছি; আর তুমি আমার পুত্র হইয়াও নরকের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছ। এখনও তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি; যদি তুমি এখন হইতে অনাথগণের ভরণ-পোষণে নিরত হও, তবেই তোমার রক্ষা; নচেৎ এই বজ্রের আঘাতে তোমার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিব।

ইহার পর ইন্দ্র নিম্নলিখিত কবিতা কয়টাতে দানের গুণ ও অদানের দোষ ব্যাখ্যা করিলেন:—

কৃপণের এই ভয়, যদি করি দান,
ক্ষুধা-পিপাসায় শেষে যাবে মোর প্রাণ।
অতিথি আসিলে দ্বারে, বঞ্চিত করিয়া তারে
নিজে সে আহার করে; কি বলিব, হায়!
ক্ষুধিতের মুখপানে ফিরিয়া না চায়।
শিয়রে শমন কিন্তু দেখা দেয় যবে,
লয় কি সঞ্চিত ধন সঙ্গে কেহ কবে?
যে কল্পিত দুঃখে ভীত হ'য়ে দান নাহি দিত,
নরকে পড়িয়া পাপী সেই দুঃখ পায়;
অন্নজল নাহি সেথা ক্ষুধা-পিপাসায়।

'দিব না' একথা মুখে এন না কখন;
এ সংসারে নাই ধর্ম্ম দানের মতন।
অল্প থাকে, অল্প দেয়; যদি মধ্যবিত্ত হয়,
মধ্যম-প্রকার দান করিবে সে জন;
বহুধনে তোষে ধনী যাচকের মন।

গুরু-প্রত্যাখ্যান।

(১)

এক চণ্ডালের অতি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল; সে অকালে সুমধুর আম্র ফল উৎপাদন করিতে পারিত। সে বনে গিয়া একটা আম্রবৃক্ষের নিকটে দাঁড়াইত এবং মন্ত্র পড়িয়া তাহার উপর জল ছিটাইয়া দিত। অমনি বৃক্ষটা মুকুলে মণ্ডিত হইত, মুকুল হইতে ফল জন্মিত এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐ সকল ফল সুপক্ক হইয়া মাটিতে পড়িত। এই ফল বিক্রয় করিয়া চণ্ডাল যে অর্থ পাইত, তাহাতেই তাহার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইত।

চণ্ডালকে প্রতিদিন অকালে প্রচুর আম্র বিক্রয় করিতে দেখিয়া এক প্রবাসী ব্রাহ্মণকুমারের বড় কৌতূহল জন্মিল। সে ভাবিতে লাগিল, 'এ ব্যক্তি এত আম কোথায় পায়? এ নিশ্চয় কোন মন্ত্র জানে। চেষ্টা করিয়া দেখি, আমি সেই মন্ত্র শিখিতে পারি কি না।"

একদিন চণ্ডাল আম আনিবার জন্য বনে গিয়াছে, ইহা জানিয়া ব্রাহ্মণকুমার তাহার বাড়ীতে গেল এবং যেন কিছুই জানে না, এই ভাবে তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কর্ত্তা

কোথায়, মা?" চণ্ডালপত্নী বলিল, "তিনি বনে গিয়াছেন; একটু পরে ফিরিবেন।" ব্রাহ্মণকুমার বলিল, "আমি তাঁহার নিকট বিদ্যা শিখিতে আসিয়াছি; আপনি অনুমতি দেন তো তাঁহার জন্য অপেক্ষা করি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে চণ্ডাল আমের বাঁক কাঁধে লইয়া বন হইতে ফিরিল। ব্রাহ্মণকুমার দূর হইতে তাহাকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া গেল এবং তাহার কাঁধ হইতে বাঁক নামাইয়া নিজেই ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। চণ্ডাল তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল এবং স্ত্রীকে গোপনে বলিল, "ভদ্রে, এই যুবক মন্ত্র শিখিতে আসিয়াছে। কিন্তু এ সচ্চরিত্র নহে; কাজেই মন্ত্র রক্ষা করিতে পারিবে না।"

মন্ত্র পাইবার লোভে ব্রাহ্মণকুমার চণ্ডালের গৃহে রহিয়া গেল এবং প্রাণপণে সকলের মন যোগাইতে লাগিল। সে কখনও ধান ভানিত, কখনও বন হইতে কাঠ আনিত, কখনও কখনও নদী হইতে জল আনিয়া দিত। তাহার পরিচর্য্যায় তুষ্ট হইয়া চণ্ডালপত্নী পতিকে বলিল, "আমার মনে হয়, 'এই যুবক কোন ভদ্র বংশে জন্মিয়াছে। এ বহু যত্নে আমাদের সেবা করিতেছে; আপনি দয়া করিয়া ইহাকে মন্ত্রটী শিখাইয়া দিন।"

চণ্ডাল আপত্তি না করিয়া ব্রাহ্মণকুমারকে ডাকিয়া বলিল, "শুন, বাপু, আমি তোমাকে মন্ত্র দান করিতেছি; কিন্তু চণ্ডালের কাছে শিখিয়াছ বলিয়া যদি কখনও লজ্জাবশে গুরুর নাম গোপন কর, তবে তুমি ইহা রক্ষা করিতে পারিবে না।"

ব্রাহ্মণকুমার উত্তর দিল, "সে কি কথা! আপনি আমার গুরু, আপনার নাম গোপন করিব কেন?"

ব্রাহ্মণকুমার মন্ত্র লাভ করিয়া বারাণসীতে গেল এবং সেখানে আম বেচিতে লাগিল। একদিন রাজার উদ্যানপাল তাহার নিকট আম কিনিয়া রাজাকে খাওয়াইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অকালে এমন ভাল আম কোথায় পাইলে?" উদ্যানপাল বলিল, "মহারাজ, এক ব্রাহ্মণকুমার প্রতিদিন এইরূপ আম বেচিয়া থাকেন।" রাজা আদেশ দিলেন, "তাহাকে এখন হইতে সমস্ত আম এখানে আনিতে বল।"

(২)

ব্রাহ্মণকুমার এখন সমস্ত আমই রাজভবনে বিক্রয় করে। এক দিন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অকালে এমন ভাল আম পাও কিরূপে? তুমি কি পিশাচ বশ করিয়াছ, না কোন মন্ত্র জান?" ব্রাহ্মণকুমার উত্তর দিল, "মহারাজ, আমি মন্ত্রের প্রভাবেই আম্র উৎপাদন করি।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "আমার সমক্ষে তোমার মন্ত্রের ক্ষমতা দেখাও দেখি।" ব্রাহ্মণকুমার রাজার নিকট পরীক্ষা দিল; তাহার ক্ষমতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমাকে এই মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছে?" ব্রাহ্মণকুমার ভাবিল, 'চণ্ডালের কাছে শিখিয়াছি বলিলে লোকে আমাকে ঘৃণা করিবে। মন্ত্রটী যখন আমার কণ্ঠস্থ হইয়াছে, তখন ইহা ভুলিবার আশঙ্কা নাই।

অতএব এখন গুরুর নাম গোপন করিলে ক্ষতি কি?' মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়া সে উত্তর দিল, "মহারাজ, তক্ষশিলা নগরে একজন বিখ্যাত অধ্যাপক আছেন। তিনিই দয়া করিয়া আমাকে এই মন্ত্রটা দিয়াছেন।" কিন্তু এই কথা বলিতে না বলিতেই সে মন্ত্রটী ভুলিয়া গেল। রাজা কিন্তু তাহার মিথ্যা কথাই বিশ্বাস করিলেন এবং প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বহু পুরস্কার দিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরে রাজার আম খাইতে ইচ্ছা হইল। তিনি ব্রাহ্মণকুমারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমি বাগানে যাইব। তুমি সেখানে গিয়া আম যোগাড় কর।" ব্রাহ্মণকুমার "যে আজ্ঞা" বলিয়া বাগানে গেল; একটা আম্রবৃক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া মন্ত্রটী আবৃত্তি করিবার জন্য কত চেষ্টা করিল; কিন্তু দেখিল, সে তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। তখন সে লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল।

এই কাণ্ড দেখিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এ লোকটা পূর্ব্বে মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রচুর আম্র দিয়াছে; আর এখন কিছুই না করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া আছে!' তিনি ব্রাহ্মণকুমারকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে একটা মিথ্যা কথা দ্বারা আর একটা মিথ্যা কথা ঢাকিতে চেষ্টা করিল এবং বলিল, "মহারাজ, আজ তিথি নক্ষত্রের সুযোগ নাই; কাজেই আম উৎপাদন করিতে পারিতেছি না।

রাজা এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না; তিনি বলিলেন, 'পূর্ব্বে তো কখনও তুমি তিথি-নক্ষত্রের ওজর কর নাই? আজ

তুমি আম ফলাইতে পারিতেছ না, নিশ্চয় ইহার অন্য কোন কারণ আছে। সত্য কথা বল ; নচেৎ তোমায় ছাড়িব না।' ব্রাহ্মণকুমার তখন নিরুপায় হইয়া বলিল, "নরনাথ, এক চণ্ডাল আমাকে এই মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন কেহ জিজ্ঞাসা করিলে যদি আমি তাঁহার নাম গোপন করি, তবে মন্ত্রটী ভুলিয়া যাইব। ব্রাহ্মণ হইয়া চণ্ডালকে গুরু বলিয়া মানিয়াছি, এই লজ্জায় আমি আপনার নিকট তাঁহার নাম গোপন করিয়াছিলাম। সেই পাপে এখন আমি মন্ত্রটীর বিন্দু বিসর্গও স্মরণ করিতে পারিতেছি না।"

ব্রাহ্মণকুমারের কথা শুনিয়া রাজা তাহাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,

"গুরু বলি পূজি তাঁরে, শিক্ষা পাই যাঁর ঠাই,
দ্বিজ কিংবা শূদ্র তিনি, এ বিচারে কাজ নাই।
এরণ্ড, পলাশ, নিম—যাহাতে মৌচাক আছে,
মধু পাইবার তরে শ্রেষ্ঠ মানি সেই গাছে।"

জীমূতবাহন।

(১)

মহারাজ জীমূতকেতু শেষ বয়সে পুত্র জীমূতবাহনের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া তপস্যা করিবার জন্য সহধর্ম্মিণীর সহিত বনে গমন করিলেন।

কিন্তু রাজপদ জীমূতবাহনের ভাল লাগিল না। তিনি ভাবিলেন, 'আমার বৃদ্ধ মাতাপিতা অরণ্যবাসের ক্লেশ ভোগ

করিতেছেন, আর আমি রাজসুখে আসক্ত রহিয়াছি! যদি তাঁহাদের সেবা করিতে না পারিলাম, তবে আমার এ জীবনে প্রয়োজন কি?' অনন্তর, প্রধান অমাত্যের স্কন্ধে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া, তিনিও বনে গমন করিলেন এবং মলয়পর্ব্বতে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক জনকজননীকে সেখানে লইয়া গেলেন।

মলয়পর্ব্বতের রাজা বিশ্বাবসুর মলয়বতী নাম্নী এক অতি রূপবতী ও গুণবতী কন্যা ছিলেন। তিনি প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে ভগবতী গৌরীদেবীর আরাধনা করিয়া বর পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামী রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন। জীমূতবাহন যখন মলয়পর্ব্বতে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন, তখন গৌরীর এই আশীর্ব্বাদ সফল হইবার সুযোগ ঘটিল। তাঁহার সহিত মলয়-বতীর বিবাহ হইল, তাঁহার বৃদ্ধ মাতাপিতা পুত্রবধূর মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিলেন।

একদিন জীমূতবাহন বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, একস্থানে পর্ব্বতপ্রমাণ তুষারধবল অস্থিপুঞ্জ রহিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তিনি শুনিলেন যে, পক্ষিরাজ গরুড় পূর্ব্বে প্রতিদিন নাগলোকে গিয়া নাগ ধরিয়া খাইতেন; যাহারা তাঁহার কুক্ষিগত হইত না, তাহারাও অনেকে ভয়ে বা তাঁহার পক্ষাঘাতে প্রাণত্যাগ করিত। ইহা দেখিয়া নাগরাজ বাসুকি গরুড়কে বলিয়াছিলেন, "নিরর্থক এরূপে জীবহত্যা করিলে নাগকুল নির্মূল হইবে, আপনারও আহারের অভাব ঘটিবে। অতএব আপনি আর নাগলোকে আসিবেন না; আমি আপনার আহারের জন্য মলয়পর্ব্বতে প্রতিদিন একটী

করিয়া নাগ প্রেরণ করিব।" গরুড় এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। তখন হইতে বাসুকি প্রত্যহ একটী নাগ প্রেরণ করিতেছেন। এই সকল নাগের অস্থিগুলি ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়াছে।

(২)

নাগলোকের দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিয়া জীমূতবাহনের বড় দুঃখ হইল। তিনি ভাবিলেন, 'এই কি বাসুকির রাজধর্ম্ম? তিনি নিজে জীবিত রহিয়াছেন, আর যাহারা তাঁহার আশ্রিত, তাহাদিগকে একে একে শমনসদনে পাঠাইতেছেন! আমি যদি নাগরাজ হইতাম, তবে এ অবস্থায় সর্ব্বাগ্রে নিজের প্রাণ দিতাম। পক্ষিরাজ গরুড়ও কি নিষ্ঠুর! তিনি জঠরজ্বালা নিবৃত্তির জন্য প্রতিদিন প্রাণিহত্যা করিতেছেন! জগতে কি অন্য খাদ্য এতই দুর্লভ যে, নশ্বর দেহধারণের জন্য অপরের প্রাণ লইতে হয়?'

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জীমূতবাহন বেলাভূমিতে অবতরণ করিলেন এবং সেখানে এক রমণীর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা এক নাগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে এবং এক জন ভৃত্য রক্তবস্ত্র-যুগল লইয়া উহাদের অনুগমন করিতেছে।* বৃদ্ধা বিলাপ

---

* অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, নাগেরা সর্প হইলেও ইচ্ছামত মানবের রূপ ধারণ করিতে পারে।

পূর্ব্বে যাহাদের প্রাণদণ্ড হইত, তাহাদিগকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার কালে রক্তবস্ত্র পরাইবার ব্যবস্থা ছিল।

করিতেছিল, 'হা পুত্র শঙ্খচূড়! আমি মা হইয়া কিরূপে তোমাকে গরুড়ের মুখে ফেলিয়া যাইব? তোমাকে হারাইয়া আমি মুহূর্ত্তের জন্যও প্রাণধারণ করিতে পারিব না; আমি আত্মহত্যা করিয়া পুত্রশোকের জ্বালা ভুলিব।" শঙ্খচূড় বলিতেছিল, "মা, আপনি এত কাতর হইবেন না। জগতে কেহই অমর হইয়া আসে নাই। নাগরাজ যখন আদেশ দিয়াছেন, তখন আমাকেই আজ গরুড়ের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখুন, আজ যদি আমার না হইয়া অন্য কাহারও বার হইত, তবে সে হতভাগ্যেরও কি এই দশা ঘটিত না? আপনি বৃথা শোক করিবেন না; গৃহে ফিরিয়া যান। সম্মুখে বধ্যশিলা দেখা যাইতেছে; আমি রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া উহাতে আরোহণ করি। গরুড়ের আসিতে বোধ হয় অধিক বিলম্ব নাই।"

জীমূতবাহন সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমি নিজের শরীর দান করিলে শঙ্খচূড় ও তাহার জননী, উভয়েরই প্রাণ রক্ষা হইবে; নচেৎ বৃদ্ধা পুত্রশোকে আত্মহত্যা করিবে। একটী জীবনের বিনিময়ে দুইটী জীবনরক্ষা—এ বড় সামান্য লাভ নহে। বিশেষতঃ এই নাগ স্বজন-পরিত্যক্ত ও একান্ত অসহায়। ইহাকে রক্ষা করিলে আমি অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারিব।'

(৩)

জীমূতবাহন শঙ্খচূড়ের সম্মুখীন হইলেন। বৃদ্ধা মনে করিল, গরুড়ই বুঝি মানুষের বেশে উপস্থিত হইয়াছেন। সে পুত্রকে

অঞ্চল দিয়া আবৃত করিল, এবং নতজানু হইয়া বলিল, "ভগবন্ বিনতানন্দন, আমাকে ভক্ষণ করুন। আপনার আহারের জন্য আজ বাসুকি আমাকেই প্রেরণ করিয়াছেন।"

বৃদ্ধার অপত্যস্নেহ দেখিয়া জীমূতবাহনের সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হইল। শঙ্খচূড় তাহার মাতাকে আশ্বাস দিতেছিল—বলিতেছিল, "ভয় নাই, মা। ইনি গরুড় নহেন। দেখুন না, ইঁহার কি সৌম্যমূর্ত্তি! ইঁহার মুখমণ্ডলের প্রতি রোমকূপ হইতে করুণার উৎস ছুটিয়াছে।" জীমূতবাহন এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন, "মা, আপনি ঐ রক্তবস্ত্রযুগল আমায় দিন। আমি নিজের শরীর দান করিয়া আপনার পুত্রকে রক্ষা করিব।" বৃদ্ধা কাণে আঙ্গুল দিয়া বলিল, "এমন অমঙ্গলের কথা মুখে আনিতে নাই, বাবা! আপনি শঙ্খচূড় অপেক্ষাও আমার অধিকতর স্নেহের পাত্র, কারণ আপনি তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য অযাচিতভাবে নিজের দেহ উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমি কি নিজের পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য পরের পুত্রের প্রাণহানি করিব? ঈশ্বর যেন কখনও আমাকে এমন কুমতি না দেন।"

জীমূতবাহনের প্রস্তাব শুনিয়া শঙ্খচূড়ও অবাক্ হইয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, 'এ কি স্বপ্ন, না প্রকৃত ঘটনা? নরলোক তো তুচ্ছ, দেবলোকেও এমন আত্মবিসর্জ্জনের কথা শুনা যায় না!' সে বলিল, "মহাভাগ, আমার মত তুচ্ছ জীব কত শত জন্মিতেছে ও মরিতেছে; তাহাতে জগতের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইতেছে না। কিন্তু আপনার ন্যায় সদাশয় ব্যক্তি যে এক কল্পেও একটী

পাওয় যায় না। আপনার জীবনের বিনিময়ে আমার জীবন রক্ষা করিলে জগতের ভয়ানক অনিষ্ট হইবে ; নাগবংশেও চিরদিনের জন্য কলঙ্ক রহিয়া যাইবে।" জীমূতবাহন কিন্তু কিছুতেই নিজের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না ; কিরূপে ইহা সিদ্ধ করিবেন, তিনি সেই অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

(৪)

অনতিদূরে একটা শিবমন্দির ছিল , শঙ্খচূড় তাহার মাতা ও ভৃত্যকে লইয়া দেবতাকে প্রণাম করিতে গেল। এই সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া জীমূতবাহনকে দুইখানি রক্তবস্ত্র দিয়া বলিল, "আপনার শ্বশ্রূমাতা দীপোৎসবের উপলক্ষ্যে আপনাকে এই উপহার পাঠাইয়া দিয়াছেন।" জীমূতবাহন বস্ত্রযুগল গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "ভদ্র, তুমি এখনই ফিরিয়া যাও ; শ্বশ্রূমাতাকে আমার প্রণাম জানাইবে এবং বলিবে যে তাঁহার প্রসাদের এই নিদর্শনে আমি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

ঐ ব্যক্তি চলিয়া গেলে, জীমূতবাহন শ্বশ্রূদত্ত বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া বধ্যশিলায় আরোহণ করিলেন। পরার্থে প্রাণ-পরিত্যাগের সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার মনে অপূর্ব্ব প্রীতির সঞ্চার হইল। অনন্তর নভোমণ্ডলে বিনা মেঘে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনা গেল এবং প্রচণ্ডবেগে বায়ু বহিতে লাগিল। জীমূত-বাহন বুঝিলেন যে, গরুড় আসিতেছেন। তিনি সানন্দে বলিলেন, "অদ্য এই নাগকে রক্ষা করিয়া আমি যে পুণ্য অর্জ্জন করিব, তাহার প্রভাবে যেন জন্মে জন্মে পরহিতের জন্যই দেহধারণ করিতে পারি।"

গরুড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আসিয়াছিলেন ; তিনি অবতীর্ণ হইয়াই জীমূতবাহনকে গ্রহণ করিলেন। অমনি আকাশ হইতে পুষ্প-বৃষ্টি হইল ; সুরলোকে দুন্দুভি বাজিল ; দেবতারা জীমূতবাহনের এই অদ্ভুত আত্মোৎসর্গ দেখিয়া ধন্য ধন্য বলিতে লাগিলেন। গরুড় তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য মলয়গিরির এক তুঙ্গ শৃঙ্গের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

(৫)

জীমূতকেতু পত্নী ও পুত্রবধূর সহিত উটজাঙ্গনে উপবেশন করিয়া বলিতেছিলেন, "দেবতারা আমার সমস্ত আশাই পূর্ণ করিয়াছেন। আমি যৌবনে বিষয়সুখ ভোগ করিয়াছি, সাধ্বী ও সুশীলা সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়াছি ; রাজত্বে যশস্বী হইয়াছি ; জীমূতবাহনের ন্যায় সর্ব্বগুণধর পুত্র আমার বংশ উজ্জ্বল করিয়াছে ; আমি এখন নিশ্চিন্তমনে পুণ্য অর্জ্জন করিতেছি এবং লক্ষ্মীরূপা পুত্রবধূর যত্নে বার্দ্ধক্যেও মাতৃস্নেহ পাইতেছি। কিন্তু জগতে সমস্তই অনিত্য ; কখন কোন্ বিপদ্ ঘটে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ইহাতে মনে হয়, এখন শীঘ্র মরিতে পারিলেই আমার পক্ষে মঙ্গল।"

জীমূতকেতু ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় মৃত্যুকামনা করিতেছেন, এমন সময়ে আকাশ হইতে একটা রক্তলিপ্ত মণি তাঁহার পাদমূলে পতিত হইল। জীমূতবাহন অনেকক্ষণ আশ্রম হইতে গিয়াছেন, তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে, এজন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই একটু উদ্‌বিগ্ন হইয়াছিলেন ; এক্ষণে অকস্মাৎ এই মণি পড়িতে দেখিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা অনিষ্টাশঙ্কায় অভিভূত

হইল। তাঁহার পত্নী মণিটা দেখিয়া বলিলেন, "এ যে আমার জীমূতবাহনের শিরোরত্ন বলিয়া বোধ হইতেছে!" কিন্তু পরিচারকেরা তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিল, "ভয়ের কারণ নাই; গরুড় যে সকল নাগ ভক্ষণ করেন, তাহাদের শিরোমণিগুলি মলয়পর্ব্বতের নানাস্থানে বিকীর্ণ রহিয়াছে। পক্ষীরা কখনও কখনও মাংস মনে করিয়া ঐ মণিগুলি তুলিয়া লইয়া যায় এবং যখন দেখে, তাহাদের ভ্রম হইয়াছে, তখন সেগুলি ফেলিয়া দেয়।"

এদিকে শঙ্খচূড় মন্দির হইতে ফিরিয়া দেখিল, গরুড় জীমূতবাহনকে লইয়া উড়িয়া যাইতেছেন। সে বুঝিল, তাহারই ত্রুটিবশতঃ এই মহান্ অনর্থ ঘটিয়াছে। সে মন্দিরে না গেলে জীমূতবাহন বধ্যশিলায় অধিরোহণ করিবার অবসর পাইতেন না। গরুড় যেখানে বসিয়া নাগ ভক্ষণ করিতেন, সে এখন সেই দিকে ছুটিল; ভাবিল, 'যদি গরুড়কে তাঁহার ভ্রম বুঝাইয়া এই মহাপুরুষের জীবন রক্ষা করিতে পারি, তবেই আমার শান্তি, নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব।'

শঙ্খচূড় ছুটিতেছে, আর বিলাপ করিতেছে, "এই নাগাধম শঙ্খচূড়ের প্রাণরক্ষার্থ এক মহাপুরুষ নিজের দেহ উৎসর্গ করিলেন। এ পাপের জন্য আমার নরকেও স্থান হইবে না। তোমরা কে কোথায় আছ, আমার সঙ্গে চল; দেখিব, যদি গরুড়কে বলিয়া এখনও তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারা যায়।" সে যখন জীমূতকেতুর আশ্রমের নিকট দিয়া যাইতেছিল, তখন এই কথাগুলি আশ্রমবাসীদিগের কর্ণগোচর হইল। পূর্ব্ব

হইতেই জীমূতকেতুর মনে ভাবী অমঙ্গলের ছায়া পড়িয়াছিল; এখন শঙ্খচূড়ের বিলাপ শুনিয়া তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তিনি পত্নী ও মলয়বতীকে সঙ্গে লইয়া শঙ্খচূড়ের অনুগামী হইলেন।

(৬)

গরুড় পর্ব্বতশৃঙ্গে বসিয়া ভোজন আরম্ভ করিলেন। তিনি জীমূতবাহনের দেহ বিদারণ করিয়া বার বার রক্ত পান করিতেছেন; মধ্যে মধ্যে মাংস ছিঁড়িয়া গিলিতেছেন, তথাপি তাঁহার মুখমণ্ডলে যন্ত্রণার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইতেছেন না। আর্ত্ত-নাদ করা দূরে থাকুক, জীমূতবাহন যেন অপার আনন্দ অনুভব করিতেছেন। তিনি বার বার গরুড়কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "বিহগবর, আমার মাংসে আপনার তৃপ্তি হইতেছে তো?"

এই সমস্ত দেখিয়া গরুড়ের মনে বড় বিস্ময় জন্মিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "আজন্ম নাগ ভক্ষণ করিতেছি, কিন্তু এমন অদ্ভুত ধৈর্য্য তো কখনও লক্ষ্য করি নাই! আমি এই ব্যক্তির রক্ত পান করিতেছি, মাংস ছিঁড়িয়া লইতেছি, অথচ ইহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া ইনি বরং হৃষ্ট হইতেছেন এবং আমার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতেছেন! ইনি নিশ্চয় নাগ নহেন; ইনি হয় কোন দেবতা,—নরদেহ ধারণ করিয়া আমাকে ছলনা করিতেছেন; নয় কোন দেবকল্প মহাপুরুষ,—নাগকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মদেহ উৎসর্গ করিয়াছেন। ইঁহাকে গ্রহণ করিয়া আমি মহাপাতকী হইলাম।'

গরুড়কে ভোজনে বিরত দেখিয়া জীমূতবাহন বলিলেন, "আপনি ভোজন করিতেছেন না কেন? এখনও আমার রক্ত নিঃশেষ হয় নাই, এখনও আমার দেহে যথেষ্ট মাংস আছে। আপনি তৃপ্তির সহিত পানভোজন করুন, নচেৎ আমি দুঃখিত হইব।" গরুড় বলিলেন, "আপনি কে? অনুগ্রহ করিয়া পরিচয় দিন।"

জীমূতবাহন কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, "ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন, উনি নাগ নহেন, উনি লোকবিখ্যাত মহাত্মা জীমূতবাহন। মহারাজ বাসুকির আদেশে আজ আমিই আপনার খাদ্য: আপনি ভ্রমবশতঃ ঐ মহাপুরুষকে গ্রহণ করিয়াছেন; উঁহাকে ছাড়িয়া দিন এবং আমার রক্তমাংসে ক্ষুধানিবৃত্তি করুন," উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে শঙ্খচূড় সেখানে উপস্থিত হইল।

তখন গরুড় বুঝিলেন, তিনি যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা অমূলক নহে। 'হায়, ত্রিভুবনে সকলেরই মুখে যাহার গুণগান শুনিতে পাই, আমি সেই করুণাসিন্ধু জীমূতবাহনের প্রাণহন্তা হইলাম! এ পাপের যে তুষানলেও প্রায়শ্চিত্ত হইবে না'—ইহা ভাবিয়া গরুড় জীমূতবাহনের পাদমূলে পতিত হইলেন এবং বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। জীমূতবাহন বলিলেন, "বিহগবর, আমি স্বেচ্ছাক্রমেই আত্ম-শরীর দান করিয়াছি; অতএব ইহাতে আপনার কোন অপরাধ হয় নাই। কিন্তু, আপনি যে প্রতিদিন জীবহত্যা করেন, ইহা অতি গর্হিত কার্য্য। আপনি যদি প্রকৃতই অনুতপ্ত হইয়া

থাকেন, তবে এখন হইতে হিংসা ত্যাগ করুন এবং সর্ব্ব প্রাণীকে অভয় দিন।” গরুড় উত্তর দিলেন, “এত দিনে আমার ভ্রম ঘুচিয়াছে। আমি লম্বোদরের জন্য কত লক্ষ প্রাণী সংহার করিয়াছি, আর আপনি একটী প্রাণী রক্ষা করিবার জন্য নিজের দেহ ত্যাগ করিয়াছেন! আপনি স্বর্গের দেবতা, আর আমি নরকের কীট! আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখনও প্রাণিহত্যা করিব না।”

(৭)

ইত্যবসরে জীমূতকেতু, তাঁহার পত্নী ও মলয়বতী সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা জীমূতবাহনের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গরুড়ের যত্নে তাঁহাদের চৈতন্য-সম্পাদন হইল; এদিকে জীমূতবাহন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। গরুড় ভোজনে বিরত হইবার পর হইতেই তিনি তীব্র বেদনা অনুভব করিতেছিলেন; প্রভূত রক্তস্রাবে তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি নিতান্ত শিথিল হইয়াছিল। তিনি অন্তিম সময় সমাগত দেখিয়া মাতাপিতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিলেন এবং একবার মলয়বতীর দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক নিমীলিত-নেত্রে ইষ্ট দেবতাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। গরুড় দেখিলেন, অমৃতসেচন ভিন্ন অন্য উপায়ে জীমূতবাহনকে বাঁচাইতে পারা যাইবে না। তিনি অমৃত আনয়ন করিবার জন্য নিমিষের মধ্যে স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

জীমূতকেতু বলিলেন, “বৎস শঙ্খচূড়, তুমি সত্বর চিতা সজ্জিত কর। আমরা তিন জনে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া ভব-

যন্ত্রণা হইতে নিস্কৃতি লাভ করিব। অনন্তর মলয়বতী ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, "মাত-গৌরি, আপনি না বলিয়াছিলেন, আমার স্বামী রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন! আমার মত হতভাগিনীর জন্য আপনি কেন মিথ্যা-বাদিনী হইলেন, মা?" তখন গৌরী সেখানে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন "বৎসে, আমি কি কখনও মিথ্যাবাদিনী হইতে পারি? বৎস জীমূতবাহন, তুমি নিজের জীবন দিয়া জগতের হিতসাধন করিলে; ইহাতে আমি বড়ই প্রসন্ন হইয়াছি অতএব তুমি নব-জীবন লাভ কর এবং তোমার এই নূতন জীবন পূর্ব্বাপেক্ষাও মহত্তর হউক।" ইহা বলিয়া তিনি কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া জীমূতবাহনের গায়ে ছিটাইয়া দিলেন; অমনি জীমূতবাহন অক্ষতদেহে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। এদিকে সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, বিনামেঘে বৃষ্টি হইতেছে এবং তাহার স্পর্শে সেই পর্ব্বতপ্রমাণ অস্থিগুলি সহস্র সহস্র নাগের আকারে সাগরজলে চলিয়া যাইতেছে। তাঁহারা বুঝিলেন যে, ইহা গরুড়ের কীর্ত্তি; তিনি অমৃত আনিয়া বর্ষণ করিতেছেন এবং এতকাল যে সকল নাগ নিহত করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে নব-জীবন দিয়া নাগলোকে পাঠাইয়া দিতেছেন।

দধীচির দেহত্যাগ।

দৈত্যরাজ বৃত্র আজন্ম ইন্দ্রের পরম শত্রু ছিলেন। ইহার উপর আবার যখন তিনি ব্রহ্মাকে তপস্যায় প্রসন্ন করিয়া বর পাইলেন যে, তৎকালে খড়্গ, তীর, শক্তি প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র শস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহাদের কোনটীর আঘাতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইবে না, তখন তিনি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কাড়িয়া লইলেন এবং নিজেই গিয়া অমরাবতীতে রাজত্ব আরম্ভ করিলেন। ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবা তখন তাঁহারই বাহন হইল, নন্দনকানন, পারিজাত পুষ্প প্রভৃতি যে সকল এতকাল কেবল ইন্দ্রের ভোগ্য ছিল, সেগুলি এখন তাঁহার সেবায় নিয়োজিত হইল।

ইন্দ্র ও তাঁহার অনুচরগণ বৃত্রের ভয়ে গিরিকন্দরে লুকাইয়া রহিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহারা শান্তি পাইলেন না; বৃত্র পাছে অতর্কিতভাবে উপস্থিত হইয়া আবার তাঁহাদিগকে পীড়ন করেন, এই ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা কাঁপিতে লাগিলেন। শেষে কলে গিয়া দেবাতিদেব বিষ্ণুর শরণ লইলেন। তাঁহাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া বিষ্ণুর দয়া হইল। তিনি বলিলেন, "বৃত্রের বধার্থ নূতন উপাদানে অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তোমরা দধীচি মুনির কাছে যাও। তিনি যদি তোমাদের প্রার্থনায় দেহত্যাগ করেন, তবে তাঁহার অস্থিদ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিবে। ইন্দ্র ঐ বজ্রের আঘাতে বৃত্রের প্রাণবধ করিতে পারিবেন।"

দধীচি প্রাচীনকালের একজন মহর্ষি। শিবের প্রধান অনুচর নন্দী তাঁহার শিষ্য। দক্ষযজ্ঞে যখন মহাদেবকে অবমানিত করিবার প্রস্তাব হয়, তখন তিনি উহাতে বাধা দিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষ তাঁহার উপদেশে কর্ণপাত করেন নাই; এই জন্য তাঁহার যজ্ঞ পণ্ড হইয়াছিল।

পুণ্যতোয়া সরস্বতী নদীর তীরে দধীচির আশ্রম ছিল। তাঁহার পুণ্যবলে সেখানে চিরশান্তি বিরাজ করিত—ব্যাঘ্র ও হরিণ, সর্প ও নকুল এক ঘাটে জল খাইত। তিনি সেই শান্তিনিকেতনে শিষ্যদিগকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন, এমন সময়ে ইন্দ্র ও তাঁহার অনুচরেরা সেখানে উপস্থিত হইলেন। দধীচি পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "আমি বৃত্রের অত্যাচারের কথা শুনিয়াছি এবং তাহাতে বড় দুঃখিতও হইয়াছি। কিন্তু আমার সাধ্য কি, যে এই বিপদে আপনাদিগের কোন সাহায্য করিতে পারি? যদি উপায় থাকিত, তবে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না।"

দেবতারা কি বলিয়া আপনাদের প্রার্থনা জানাইবেন, তাহা ভাবিতেছিলেন; 'প্রাণ দিবার' কথায় তাঁহারা সুযোগ পাইলেন; তাঁহারা অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "ভগবন্, বলিতে সাহস হয় না; আপনি প্রাণ দিলে কিন্তু আমাদের দুঃখমোচন হয়; কারণ দেবাতিদেব বিষ্ণু বলিয়াছেন যে, আপনার অস্থিদ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিলে তাহার আঘাতে বৃত্রের প্রাণনাশ হইবে।"

দধীচি সহাস্যবদনে বলিলেন, "উত্তম কথা। আমার এই নশ্বর দেহ দ্বারা যদি দেবলোকের মঙ্গল হয়, তবে তো আমার পরম সৌভাগ্য!" অনন্তর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে যোগবলে প্রাণত্যাগ করিলেন; তাঁহার অস্থিদ্বারা বজ্র নির্ম্মিত হইল; সেই বজ্রের আঘাতে ইন্দ্র বৃত্রকে সংহার করিলেন এবং দেবতারা স্ব স্ব অধিকার ফিরিয়া পাইলেন।

☞ দধীচির প্রাণবিসর্জ্জন পুরাণের কথা। এখনও যুগে যুগে এইরূপ অদ্ভুত আত্মত্যাগ চলিতেছে। যখনই দেবাসুরে, ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে, সত্যে ও মিথ্যায় বিবাদ ঘটে এবং ক্ষণকালের জন্য অমঙ্গলের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, তখনই দধীচির ন্যায় কোন না কোন মহাত্মা লোকহিতের জন্য অম্লানবদনে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন, এবং তাঁহার চরিত্রের সারাংশ লইয়া—তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া—কেহ না কেহ এমন শক্তি লাভ করেন, যাহা বজ্র অপেক্ষাও অমোঘ, যাহার প্রভাবে ধর্ম্মের আবার জয় হয় এবং অত্যাচার, অবিচার তিষ্ঠিতে পারে না!